ইনতিসাব

মরহুম দাদাজান জনাব মুহাম্মাদ ইয়াসীন ছাহেব রহ.-এর পবিত্র রূহের ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে, হে আল্লাহ! আপনি তাঁর কবরকে নূরে নূরে ভরে দিন।

–হাসান সিদ্দীক বিন মাশহুদ

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

"বিনয় ও তাওবা : মুমিনের অপরিহার্য দুটি গুণ" মূলত যুগ শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, ইতিহাসের এক মহাবিস্ময়, কিংবদন্তী ইসলামী স্কলার, লক্ষাধিক আলেমবৃন্দের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন উসতায, ইসলামী দুনিয়ার অন্যতম অভিভাবক ব্যক্তিত্ব, পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম করাচীর স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম, মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, আরেফ বিল্লাহ হযরত ডা. আব্দুল হাই আরেফী ও মাসীহুল উম্মাত হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব জালালাবাদী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা, শাইখুল ইসলাম হযরাতুল আল্লাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের দুটি চমৎকার বয়ানের সহজ সরল বঙ্গানুবাদ।

যাতে আছে দিশেহারা পেরেশান মুসলিম জাতির জন্য যথাযথ দিক নির্দেশনা ও পথ-পাথেয়।

হযরতের প্রতিটি বয়ান বোধগম্য উপস্থাপনায় সুসমৃদ্ধ হওয়ার কারণে আওয়াম খাওয়াস তথা সর্বশ্রেণীর মানুষ খুব সহজেই উপকৃত হতে পারেন।

বক্ষ্যমাণ দুটি বয়ানও এর ব্যতিক্রম নয়।

বয়ান দুটির আলোচ্য বিষয়ও অত্যন্ত সময়োপযোগী। কেননা বর্তমানে আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা হল আমরা প্রত্যেকেই আমার সিদ্ধান্তকেই সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করি। আমার চিন্তা চেতনাকেই যথার্থ ও সঠিক মনে করি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর মূল কারণ হল অহংকার। তথা বিনয় ও নম্রতার অভাব। আজকে যদি আমাদের মধ্যে এ মহৎ গুণটি থাকত, তাহলে সমাজে থাকত না এত মারামারি হানাহানি কাটাকাটি খুনোখুনি। এখন কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছি না। পর মত সহিষ্ণুতা গেছে উধাও হয়ে। পারস্পরিক মিল-মহব্বত, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা আশংকাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে।

মূলত এ কারণেই تواضع : رفعت اور بلندی کا ذریعہ বা “বিনয় : সম্মান ও মর্যাদার সোপান” শিরোনামে আমি অধম বয়ানটির অনুবাদ সম্পন্ন করি।

অধুনালুপ্ত মাসিক রাহমানী পয়গামে ২০০০ ঈসায়ী বর্ষ হতে ২০০১ ইং পর্যন্ত বয়ানটির অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পাঠক সমাজে ব্যাপক সাড়া পড়ে। আমিও উৎসাহিত হয়ে এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের পরামর্শে ২০০৭ ইং সালে সর্বপ্রথম এটাকে দুই মলাটে বন্দী করে মুদ্রণের ব্যবস্থা করি। বইটিও আলহামদুলিল্লাহ শাইখুল ইসলাম ছাহেব হাফিযাহুল্লাহ এর ব্যক্তিত্বের বরকতে বারবার মুদ্রিত হতে থাকে।

ইত্যবসরে ২০২০ ঈসায়ী বর্ষে আমার সৌভাগ্য হয় হযরতওয়ালার আরেকটি সুন্দর বয়ান অনুবাদ করার। আর সেটা হল توبہ: گناہوں کا تریاق বা “তাওবা : গুনাহসমূহের প্রতিষেধক”।

বলা বাহুল্য যে, এটাও শাইখুল ইসলাম ছাহেব মা. আ. এর যুগোপযোগী হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টিকারী যুগান্তকারী একটি বয়ান। কারণ একমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. ব্যতীত আর কোন মানুষ নাই যার গুনাহ হয় না। কমবেশী গুনাহ ও অন্যায় কাজ আমাদের দ্বারা হয়েই যায়। এ জন্যই তো প্রবাদ প্রসিদ্ধ : মানুষ মাত্রই ভুল করে।

তবে মহান আল্লাহ এত দয়ালু ও মেহেরবান যে, মানুষ যত বড় অন্যায় করুক ‘তাওবা’ করা মাত্রই তিনি মানুষকে ক্ষমা করে দেন। শুধু তাই নয় বরং তার গুনাহগুলোকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করে দেন। সুবহানাল্লাহ।

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللهُ

"আর আল্লাহ ছাড়া কে আছে যে গুনাহসমূহ মার্জনা করতে পারে"?[১]

ফলশ্রুতিতে এটাকেও গ্রন্থরূপ দিয়ে অধমের নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুল কুতুব থেকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করি।

মহান আল্লাহর শোকর যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বইটির সমস্ত কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

এখন উভয় গ্রন্থের পুণঃ মুদ্রণের সময় মুখলিস বন্ধু বান্ধবের পরামর্শে এবং আরো কিছু মাসলাহাতের কারণে বয়ান দুটোকে এক সাথে "বিনয় ও তাওবা : মুমিনের অপরিহার্য দুটি গুণ" শিরোনামে প্রকাশ করা হচ্ছে।

আশা ও প্রত্যাশা, সম্মানিত পাঠক পাঠিকাবৃন্দ আমাদের এবারের আয়োজনটাকেও সাদরে গ্রহণ ও বরণ করবেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে কবূল করুন ও মাকবূল বানিয়ে দিন।

আমাদের সকলকে "বিনয়" এর গুণ হাসিল করার তাউফীক দান করুন এবং "তাওবা"র মাধ্যমে গুনাহমুক্ত সুন্দর ও পবিত্র জীবন দান করুন। আমীন।

هٰذا. وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ آمِيْن يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

তারিখ
৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরী
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ ঈসায়ী
সময় : রাত ১১:৩০ মি.

বিনীত
মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদরাসা মুহাম্মাদপুর
ঢাকা-১২০৭

১. সূরা আলে ইমরান: ১৩৫

লেখকের ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

অধম গত কয়েক বৎসর থেকে স্বীয় কোন কোন মুরব্বীর নির্দেশ পালনার্থে জুমু'আর দিন আসরের পরে গুলশান ইকবাল করাচীর আল বাইতুল মুকররাম জামে মসজিদে নিজের এবং শ্রোতাবৃন্দের উপকারের উদ্দেশ্যে কিছু দ্বীনী আলোচনা করে থাকে।

এ মজলিসে সর্বস্তরের মানুষ ও মহিলাগণও শরীক হয়ে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ, অধম নিজেও এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে এবং মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে শ্রোতাবৃন্দও উপকার লাভ করছেন।

আল্লাহ তা'আলা বয়ানসমূহের এ ধারাবাহিকতাকে আমাদের সকলের সংশোধনের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন।

অধমের বিশেষ সহযোগী মাওলানা আব্দুল্লাহ মাইমান ছাহেব (সাল্লামাহু) গত বেশ কিছু দিন থেকে অধমের ঐসব বয়ানকে টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে সংরক্ষিত করে সেগুলোর ক্যাসেট প্রস্তুত করা ও সেগুলোর প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে যত্নবান হয়েছেন।

যেগুলোর ব্যাপারে আমার বন্ধু মহল থেকে জানতে পেরেছি যে, আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে সেগুলো দ্বারাও মুসলমান ভাই বোনদের ফায়দা হাসিল হচ্ছে।

ঐসব ক্যাসেটের সংখ্যা সম্ভবতঃ এ মুহূর্তে শতকের কোঠা অতিক্রম করেছে। সেগুলোর মধ্য হতেই কিছু কিছু ক্যাসেটের বয়ানকে মাওলানা আব্দুল্লাহ মাইমান সাহেব (সাল্লামাহু) লিপিবদ্ধও করে নিয়েছেন এবং সেগুলোকে ছোট্ট ছোট্ট পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছেন।

এখন তিনি ঐসব বয়ানের সমষ্টিকে (اصلاحی خطبات) (ইসলাহী খুতুবাত) বা "আত্মসংশোধনমূলক ভাষণসমূহ" নামে প্রকাশ করছেন।

এগুলোর মধ্য হতে কিছু কিছু বয়ানকে অধম দ্বিতীয়বার দেখেও দিয়েছে।

আর মাওলানা ছাহেব এ ক্ষেত্রে একটি উপকারী কাজ এটাও করেছেন যে, বয়ানসমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেসব হাদীস এসেছে, সেগুলো প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থগুলো হতে বের করে উদ্ধৃতিসমূহও লাগিয়ে দিয়েছেন। আর এভাবেই এর উপকারিতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ গ্রন্থটি অধ্যয়নের সময় এ কথাটি সকলের মনে রাখা চাই যে, এটা কোন নিয়মতান্ত্রিক লিখিত গ্রন্থ নয় বরং মাহফিলে প্রদত্ত বয়ানসমূহের সারসংক্ষিপ্ত সংকলন, যা ক্যাসেটের সাহায্যে তৈরী করা হয়েছে।

এ কারণেই এর উপস্থাপনভঙ্গী লিখিত না হয়ে মৌখিক সম্ভাষণমূলক হয়েছে।

যদি কোন মুসলমানের এই সব কথার দ্বারা উপকার হয়, তবে এটা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ; যার উপর আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা উচিৎ।

আর যদি অসতর্কতা মূলক কোন কথা বা উপকারহীন কিছু থাকে, তবে সেটাকে অবশ্যই অধমের কোন ভ্রান্তি কিংবা বিচ্যুতিরই ফসল মনে করতে হবে।

তবে আলহামদুলিল্লাহ, এসব বয়ানের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বয়ান করা নয় বরং এসবের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হল আমার সত্তাকে অতঃপর সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দকে স্ব স্ব ইসলাহ বা আত্মশুদ্ধির প্রতি মনোযোগী করা।

نہ بہ حرف ساختہ سر خوشم نہ بہ نقش بستہ مشوشم
نفسے بیاد توی زنم چہ عبارت وچہ معانیم

ভাবার্থ: কোন হরফ বা নকশা বানানোর আনন্দে আমি আনন্দিত নই বরং আমি তো আমাকে হে আল্লাহ! আপনার স্মরণে নিবদ্ধ করছি, সেটা যে কোন ভাষায় হোক কিংবা যে কোন অর্থে।

মহান আল্লাহ আপন দয়া ও অনুগ্রহে এসব বয়ানকে স্বয়ং অধম এবং পাঠকবৃন্দের সংশোধনের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

এসব বয়ান আমাদের সকলের জন্য আখেরাতের পাথেয় প্রমাণিত হোক। আল্লাহ তা'আলার নিকট আরো দু'আ করি যেন তিনি এসব বয়ান ও ওয়াযের সংকলক ও প্রকাশককেও এই খেদমতের সর্বোত্তম পুরষ্কার দান করেন। আমীন!

তারিখ
১২ই রবিউল আউয়াল
১৪১৪ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী-১৪, পাকিস্তান

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বিনয় : সম্মান ও মর্যাদার সোপান

বিনয়ের গুরুত্ব ১৮
প্রথম অবাধ্যতার ভিত্তি ১৮
আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে বিবেক খাটিয়োনা ১৮
অহংকার : সমস্ত গুনাহের মূল ১৯
বিনয়ের হাকীকত ১৯
বুযুর্গদের বিনয় ২০
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনয় ২১
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চলাফেরা ২২
হযরত থানভী রহ. এর ঘোষণা ২৩
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনয়ের প্রকাশ ২৫
এখনো চাল কাঁচা ২৬
হযরত সায়্যিদ সুলাইমান নদভী রহ. এবং তাঁর বিনয় ২৬
"আমিত্ব"কে অন্তর থেকে বের করে দাও ২৮
অহংকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ২৮
হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. এর বিনয় ২৯
মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর বিনয় ২৯
দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ. এর বিনয় ২৯
হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী রহ. এর বিনয় ৩১
হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর বিনয় ৩২
হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ.-এর বিনয় ৩৪
হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর বিনয়ের আরেকটি ঘটনা ৩৫
দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়া'কূব নানূতবী ছাহেব রহ. এর বিনয় ৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
তাঁর বিনয়ের আরেকটি ঘটনা	৩৭
একটি আশ্চর্য ঘটনা	৩৮
অহংকারের চিকিৎসা	৩৯
আল্লাহর সৃষ্টি সেবার অপূর্ব নমূনা	৩৯
একটি কুকুরের সঙ্গে কথোপকথন	৪০
হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ.	৪৩
সার কথা	৪৩
“বিনয়” ও “হীনমন্যতা”য় পার্থক্য	৪৪
“বিনয়” হল “শোকর” (কৃতজ্ঞতা) এর ফলাফল	৪৫
লোক দেখানো “বিনয়”	৪৬
নাশোকরীও যেন না হয়	৪৬
এটা “বিনয়” নয়	৪৭
অহংকার ও অকৃতজ্ঞতা থেকেও বাঁচতে হবে	৪৭
কৃতজ্ঞতা ও বিনয় কিভাবে জমা হবে?	৪৮
একটি উদাহরণ	৪৯
বান্দার মরতবা গোলামের চেয়েও কম	৪৯
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা	৫০
ইবাদতে বিনয় অবলম্বন	৫২
দুটি কাজ করুন	৫২
বিশেষ অবস্থা কখনো কাম্য নয়	৫৩
ইবাদত কবূল হওয়ার একটি আলামত	৫৩
জনৈক বুযুর্গের ঘটনা	৫৪
একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত	৫৫
সমস্ত কথার সারকথা	৫৫
বিনয় অর্জনের পদ্ধতি	৫৬
বেশি করে শোকর আদায় কর	৫৬
“শোকর”-এর অর্থ	৫৭
শেষ কথা	৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠা

তাওবা : গুনাহসমূহের প্রতিষেধক

প্রিয়নবী সা.-এর শতবার ইসতিগফার পাঠ করা	৬১
গুনাহের কুমন্ত্রণা সকলের মনেই আসে	৬২
এই ভাবনা ভুল	৬৩
যৌবনকালে তাওবা করুন	৬৪
বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্যের প্রভাব	৬৫
সব সময় নফসের নেগরানী জরুরী	৬৬
জনৈক কাঠুরিয়ার ঘটনা	৬৭
নফসও একটি অজগর	৬৭
সমস্ত গুনাহের প্রতিষেধক হল “ইসতিগফার” এবং “তাওবা”	৬৮
কুদরতের অদ্ভূত কারিশমা	৬৮
খলীফাতুল আরয তথা জমিনের প্রতিনিধিকে প্রতিষেধক দিয়ে পাঠিয়েছেন	৭০
“তাওবা” তিনটি জিনিসের সমষ্টি	৭১
“কিরামান কাতিবীন” এর মধ্যে একজন আমীর আর অপরজন মামূর	৭২
শতবার তাওবা করলেও ফিরে আসো	৭৩
রাত্রে শোয়ার পূর্বে তাওবা করে নিন	৭৪
গুনাহের আশংকা দৃঢ় ইচ্ছার বিপরীত নয়	৭৪
হতাশ হবেন না	৭৫
শয়তান নৈরাশ্য সৃষ্টি করে	৭৬
তাওবার কারণে মুহূর্তের মধ্যে সব গুনাহ উড়ে যায়	৭৭
ইসতিগফারের মর্ম	৭৭
এমন ব্যক্তি কি হতাশ হয়ে যাবে?	৭৮
হারাম উপার্জনকারী ব্যক্তি কী করবে?	৭৮
তাওবা নাই তো ইসতিগফার করবে	৭৯
ইসতিগফারের উত্তম শব্দাবলী	৮০
সায়্যিদুল ইসতিগফার	৮১
একটি চমৎকার হাদীস	৮২

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানুষের মধ্যে গুনাহের যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন	৮৩
এটা ফেরেশতাদের কোন কৃতিত্ব নয়	৮৪
জান্নাতের স্বাদসমূহ শ্রেফ মানুষের জন্য	৮৫
কুফরও হেকমতশূন্য নয়	৮৫
দুনিয়ার প্রবৃত্তি ও গুনাহ হল জ্বালানী কাঠ	৮৬
ঈমানের মিষ্টতা	৮৬
গুনাহ সৃষ্টি করার হেকমত	৮৭
তাওবার মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি	৮৭
হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর ঘটনা	৮৮
নতুবা অন্য মাখলূক সৃষ্টি করবেন	৮৯
গুনাহ থেকে বাঁচা ফরযে আইন	৯০
অসুস্থতার মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি	৯১
তাওবা ও ইসতিগফার তিন প্রকার	৯১
তাওবার পূর্ণতা	৯২
সংক্ষিপ্ত তাওবা	৯২
তাফসীলী তাওবা	৯৩
নামাযের হিসাব করুন	৯৩
একটি অসিয়্যতনামা লিখবে	৯৫
“উমরী কাযা” আদায়	৯৫
সুন্নাতের পরিবর্তে কাযা নামায পড়া বৈধ নয়	৯৬
কাযা রোযাসমূহের হিসাব এবং অসিয়্যত	৯৬
ওয়াজিব যাকাতের হিসাব এবং অসিয়্যত	৯৭
বান্দার হকসমূহ আদায় করবে অথবা মাফ করাবে	৯৭
আখেরাতের ফিকিরওয়ালাদের অবস্থা	৯৮
বান্দার হক দায়িত্বে থেকে গেলে কী করবে?	৯৯
আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের অত্যাশ্চর্য ঘটনা	১০০
অতীত গুনাহ ভুলে যান	১০২
গুনাহ মনে আসলে ইসতিগফার করুন	১০২

বিষয়	পৃষ্ঠা
বর্তমান অবস্থার সংশোধন করুন	১০৩
"খাইরুল কুরূন" বা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ	১০৪
তাবেয়ীদের সতর্কতা ও ভয়	১০৬
হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত	১০৭
ইবলীসের কথা সত্য ছিল, কিন্তু...	১০৮
আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ	১০৯
আল্লাহ তাআলার নিকট অবকাশ চেয়ে নিয়েছে	১০৯
শয়তান বড় আরেফ ছিল	১০৯
আমি মৃত্যু পর্যন্ত বনী আদমকে প্ররোচনা দিতে থাকব	১১০
আমি মৃত্যু পর্যন্ত তাওবা কবূল করতে থাকব	১১০
শয়তান একটি পরীক্ষা	১১১
সর্বোত্তম গুনাহগার হয়ে যাও	১১২
আল্লাহ তাআলার রহমতের একশত অংশ	১১৩
ঐ দয়ালু সত্তা থেকে কিভাবে হতাশ হতে পারে?	১১৩
শুধু আকাংখা করা যথেষ্ট নয়	১১৪
জনৈক ব্যক্তির অদ্ভূত ঘটনা	১১৫

تواضع : رفعت اور بلندی کا ذریعہ

বিনয় : সম্মান ও মর্যাদার সোপান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ـ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ــ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ، قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ.

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে মহান আল্লাহ তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।” (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫২)

এখন আমি এ হাদীসটির কিছু ব্যাখ্যা পেশ করব। এ ব্যাখ্যার আলোকে বিনয়ের গুরুত্ব, বাস্তবতা এবং তার উপর আমল করার পদ্ধতি বাতলানোই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ আমাকে সঠিক ভাবে কথাগুলো বলার তাউফীক নসীব করুন। আমীন।

বিনয়ের গুরুত্ব

এ “বিনয়ের” গুরুত্ব এতই বেশি যে, যদি কোন মানুষের মধ্যে বিনয় না থাকে, তাহলে সে মানুষই ফেরআউন ও নমরূদ হয়ে যায়। কেননা অন্তরে যদি বিনয় না থাকে, তাহলে অবশ্যই অহংকার থাকবে; আর এ ‘অহংকারই’ হচ্ছে সমস্ত আত্মিক অসুখের মূল।

প্রথম অবাধ্যতার ভিত্তি

দেখুন! এ জগতে সর্বপ্রথম নাফরমানী ও অবাধ্যতা করেছে ইবলীস। সেই রেখেছে অবাধ্যতার বীজ। ইতোপূর্বে নাফরমানীর কোন কল্পনাই ছিল না। যখন মহান আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত ফেরেশতা কে সেজদা করার নির্দেশ প্রদান করেন তখন ইবলীস সেজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং বলে যে:

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝

অর্থাৎ “আমি আদম থেকে শ্রেয়, (কেননা) আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা আর আদম কে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা”।

(সূরা সোয়াদ ৭৬)

এটাই ছিল জগতের বুকে প্রথম নাফরমানীর ঘটনা। আর এ নাফরমানীর ভিত্তি ছিল সেই অহংকার বা দম্ভ। এ অহংকারের দরূনই মহান আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করেন।

অতএব বুঝা গেল, সকল অন্যায় এবং অবাধ্যতার মূল হচ্ছে এ অহংকার।

আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে বিবেক খাটিয়োনা

এ অহংকারের মূল কারণ ছিল এই যে, শয়তান স্বীয় বিবেকের উপর গর্ব করেছে। সে ভেবেছে যে, আমি বিবেক দিয়ে, যুক্তির মাধ্যমে এমন প্রমাণ পেশ করব যা খণ্ডন করা সম্ভব হবে না। আর তা

হচ্ছে এই যে, আগুন আর মাটির মধ্যে আগুন মাটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর আমি আগুনের তৈরী; সুতরাং তাকে মান্য করার প্রশ্নই উঠে না!

এ যুক্তির জন্যই সে দরবারে ইলাহী থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

আল্লামা ইকবাল রহ. তাঁর কবিতায় মাঝে মধ্যে অত্যন্ত বিজ্ঞতা জনিত কথা বলেন-

একটি কবিতায় তিনি এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলেনঃ

صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرئیل نے
جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول

হযরত "জিব্রীল (আঃ) আদি প্রভাতে আমাকে বলেছেন: যে যুক্তির ক্রীতদাস তার কথা গ্রহণ করো না।"

কেননা যেই যুক্তির গোলাম ও দাস হয়েছে, সেই আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত ও বঞ্চিত হয়েছে।

অহংকার : সমস্ত গুনাহের মূল

যাই হোক, সার কথা এটাই যে, অহংকারই হচ্ছে সমস্ত গুনাহের মূল। এ অহংকার থেকেই রাগ তৈরী হয়। উৎপত্তি হয় হিংসা ও বিদ্বেষের। এর ভিত্তিতেই অন্য মানুষের মন ভেঙ্গে দেয়া হয়। পরনিন্দা করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে বিনয় না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সব জঘন্য রোগগুলো থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে না। এ জন্য প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির জন্য বিনয় অবলম্বন করা জরুরী।

বিনয়ের হাকীকত

বিনয়ের আরবী শব্দ হচ্ছে "تواضع" (তাওয়াযু) তার অর্থ হচ্ছে নিজেকে ছোট মনে করা। নিজেকে নিজে ছোট বলাকে বিনয় বলে না। যেমনটি ইদানীং অনেকে বিনয়! প্রকাশের জন্য নিজেকে "আহকার" "নাচীজ" "গুনাহগার" "অধম" ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে থাকে,

আর ভেবে থাকে যে, এ শব্দ লিখলে বা বললেই বুঝি বিনয় অর্জন হয়ে থাকে। অথচ নিজেকে "অধম" বলাকে বিনয় বলে না বরং "অধম" ভাবাকে, মনে করাকে "বিনয়" বলে।

উদাহরণ স্বরূপঃ মনে করবে যে, আমার তো কোন শ্রেষ্ঠত্বই নেই; আমি তো কিছুই না। যদি আমি কোন ভাল কাজ করছি তাহলে সেটা একমাত্র মহান আল্লাহর তাউফীকের বদৌলতেই করছি। এখানে আমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই।

এটাই হচ্ছে "বিনয়ের" বাস্তবতা। যদি এ হাকীকত বা বাস্তবতা কারো অর্জন হয়ে যায়, তাহলে সে ব্যক্তি নিজেকে "অধম" "নাচীজ" ইত্যাদি যাই বলুকনা কেন তাতে কিছু যায় আসে না। যার মধ্যে বিনয়ের এ "হাকীকত" এসে যায়; মহান আল্লাহ তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন।

বুযুর্গদের বিনয়

যে সব বুযুর্গের কথা শুনে ও পড়ে আমরা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি; তাঁদের জীবনী পাঠ করলে জানা যায় যে, তাঁরা নিজেদের কে কতটুকু ছোট ও সামান্য মনে করতেন। এই যেমন হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. এর কথাটি আমি আমার অসংখ্য মুরব্বীদের মুখ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেনঃ "আমি নিজের তুলনায় প্রত্যেক মুসলমান কে বর্তমান অবস্থায় আর প্রত্যেক কাফেরকে ভবিষ্যত বিচারে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করি। মুসলমানদেরকে তো এজন্য উত্তম মনে করি যে, তাঁরা মুসলমান ও ঈমানওয়ালা। আর কাফেরদেরকে এ জন্য যে, হতে পারে মহান আল্লাহ তাঁদের কে ঈমান আনার তাউফীক দান করবেন; যদ্দরুন তাঁরা আমার চেয়ে আগে বেড়ে যাবে।"

একদা হযরত থানভী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা খাইর মুহাম্মাদ ছাহেব রহ. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব রহ. এর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন যে, "যখন আমি হযরত

রহ. এর মজলিসে বসি তখন আমার নিকট মনে হয় যে, সবাই আমার চেয়ে উত্তম আর আমি সবার চেয়ে অধম"।

হযরত মুফতী হাসান ছাহেব রহ. তাঁর এ কথা শ্রবণ করে বলেন যে, "ভাই! আমারও তো ঐ একই অবস্থা!! অতঃপর উভয়ে পরামর্শ করে নিজেদের এ হালত হযরত থানভী রহ. এর নিকট পেশ করা কে সমীচীন মনে করেন। ফলশ্রুতিতে তাঁরা উভয়েই হযরত থানভী রহ. এর নিকট নিজেদের এ অবস্থার কথা খুলে বললে হযরত থানভী রহ. বলেন যে, "চিন্তার কোন কারণ নেই"। তোমরা তো তোমাদের অবস্থা জানালে। আমি তোমাদের নিকট অন্তর থেকে বলছি যে, "যখন আমি মজলিসে বসি তখন আমারও এ অবস্থা হয় যে, অন্য সকল কে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম আর নিজেকে অধম মনে হয়"!!

এই হলো 'বিনয়ের' হাকীকত। আরে যখন বিনয়ের এ হাকীকত অর্জিত হয়, তখন মানুষ নিজেকে স্রেফ মানুষ থেকেই নয় বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ভাবতে থাকে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনয়

এক হাদীসে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, যখন কোন ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করতেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত অতক্ষণ পর্যন্ত সরিয়ে নিতেন না যতক্ষণ না সে ব্যক্তি নিজ হাত সরিয়ে নেয়। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ চেহারা অতক্ষণ পর্যন্ত ফিরিয়ে নিতেন না যতক্ষণ না সাক্ষাতকারী চেহারা ফিরিয়ে নিতেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সময় মজলিসে বসে থাকলেও নিজ হাঁটু অন্যদের আগে বাড়াতেন না অর্থাৎ, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের সাথে বসতেন না।

দেখুন! (তিরমিযী শরীফ শামায়িল অংশ)

হাদীসে পাকের কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, প্রাথমিক সময়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ)

সাথে স্বাভাবিক ভাবে মিলে মিশে বসতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর বসায় বা চলায় বিশেষ কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকত না। কিন্তু পরবর্তীতে সমস্যা হয় এই যে, যখন অপরিচিত ব্যক্তি মজলিসে আসতেন তখন তার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খুঁজে বের করতে বা চিনতে বড় কষ্ট হত; সে বুঝতেই পারত না যে, এ মজলিসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে?

আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বেশি হলে পিছনে উপবিষ্টদের জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক দর্শন করা মুশকিল হয়ে পড়ত; অথচ প্রত্যেকের চাহিদা ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা দেখা। ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুরোধ করে বলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! "আপনার জন্য স্বতন্ত্র কোন উঁচু স্থান হলে ভাল হয়; যেটাতে বসে আপনি কথা বলবেন যাতে অপরিচিত আগন্তুকও আপনাকে দেখে চিনতে পারে আর পিছনের সারিতে উপবিষ্টদের জন্যও আপনাকে দেখতে কোন কষ্ট না হয়; তাছাড়া এক্ষেত্রে আপনার কথা শুনতে ও বুঝতেও সুবিধা হবে"।

এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি প্রদান করেন।

ফলশ্রুতিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য একটি "চৌকি" বানিয়ে দেয়া হয় যার উপর উপবেশন করে তিনি কথাবার্তা বলতেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চলাফেরা

সুতরাং বুঝা গেল যে, মানুষের কর্তব্য হল পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য অবলম্বন না করে সাধারণ মানুষের মত থাকা। সাধারণ মানুষের ন্যায় চলাফেরা করা। তবে হ্যাঁ, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অবস্থানুযায়ী আমল

করার অবকাশ অবশ্যই আছে। এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলার বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে-

مَا رُؤِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ

অর্থাৎ "প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কস্মিন কালেও টেক লাগিয়ে খানা খেতে দেখা যায়নি আর কখনো এমনও দেখা যায়নি যে, তাঁর পিছনে পিছনে লোকজন চলছে।"

(আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৩২৭৮)

কাজেই এটা মোটেও সমীচীন নয় যে, মানুষ (নেতা) আগে চলবে আর তাঁর ভক্তরা তাঁর পিছে পিছে চলবে।

কারণ হচ্ছে এই যে, ঐ সময় কুপ্রবৃত্তি মানুষকে এভাবে প্রতারিত করতে থাকে যে, "দেখ! তোমার কত মর্যাদা; এজন্যই তো এত মানুষ তোমার পিছে পিছে আসছে" !!

এ কারণেই মানুষের অগ্রভাগে চলার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিৎ। বরং চলার সময় একাকী ভাবে অথবা মানুষের সাথে মিলে মিশে চলা উচিৎ।

হযরত থানভী রহ. এর ঘোষণা

হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর (পবিত্র) অভ্যাসসমূহের বর্ণনায় লিখা হয়েছে যে, তিনি সাধারণ ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন "কেউ আমার পিছে পিছে চলবেন না, যখন আমি কোথাও একাকী যাব তখন একাকী যেতে দিন"।

হযরত থানভী রহ. আরো বলতেন যে, "এই যে একটি অবস্থা যে, নেতৃস্থানীয় কেউ চলার সময় দু'জন মানুষ থাকবে ডানে, দু'জন থাকবে বাঁয়ে! এটা আমি একদম পসন্দ করি না। বরং যেভাবে একজন সাধারণ মানুষ চলে সেভাবেই চলা উচিৎ"।

হযরত থানভী রহ. আরো ঘোষণা করেছিলেন যে, "আমি যখন আমার হাতে কোন মালপত্র বা সামানা নিয়ে চলি তখন কেউ যেন আমার হাত থেকে সামানা না নেয়; আমাকে আমার মতই চলতে দিন"।

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. ইরশাদ করতেন যে, "দুনিয়া হল "আব্‌দিয়্যাত" বা আল্লাহর গোলামী আর নিজকে মিটিয়ে দেয়ার স্থান; কাজেই যত বেশি নিজকে মিটাবে, বিনয় অবলম্বন করবে, আর গোলামীর প্রকাশ ঘটাবে, তত বেশি আল্লাহ পাকের নিকট মাকবূল হবে ইনশাআল্লাহ"।

তিনি এ ফার্সী কবিতাটি পাঠ করতেন-

فہم خاطر تیز کردن نیست راہ
جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ এটা নয় যে, নিজেকে খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান হিসেবে প্রকাশ করবে বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা তো স্রেফ ঐ ব্যক্তিই লাভ করবে যে মহান আল্লাহর সামনে নিজ বন্দেগীর প্রকাশ ঘটাবে।

আরে ভাই! কিসের অহংকার আর কিসের গর্ব দেখাচ্ছ? গর্ব আর আনন্দের সময় তো হল সেই সময় যখন মহান আল্লাহ আমাদের রূহ কবয করবেন। যখন মহান আল্লাহ বলবেনঃ

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ﴿٢٩﴾ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ﴿٣٠﴾

দেখুন! অত্র আয়াতে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির রূহ কে বলা হচ্ছে যে, "হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর"। (সূরা আল ফাজরঃ ২৭-৩০)

এর দ্বারা বুঝে আসে যে, মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা হল মহান আল্লাহর "বন্দেগী" বা গোলামীর মর্যাদা লাভে ধন্য হওয়া।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনয়ের প্রকাশ

এ জন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ব্যাপারেই ঐ পদ্ধতি পসন্দ করতেন যে পদ্ধতিতে আল্লাহ তাআলার আবদিয়্যাত, গোলামী ও বিনয়ের প্রকাশ ঘটে। তাইতো যখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রিয়নবীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, "যদি আপনি চান তাহলে আপনার জন্য এ উহুদ পাহাড়কে আমি স্বর্ণ বানিয়ে দিব যাতে আপনার জীবিকার কষ্ট দূর হয়ে যায়"? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে, না। বরং আমার তো এটাই ভাল লাগে যে,

اَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوْعُ يَوْمًا

অর্থাৎ 'একদিন পানাহার করব আর আরেক দিন ক্ষুধার্ত থাকব।'

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২২৭০)

যেদিন খানা খাব সেদিন মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব আর যেদিন ক্ষুধার্ত থাকব সেদিন সবর ও ধৈর্য ধারণ করব।

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا

অর্থাৎ, যখনই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি ব্যাপারের যে কোন একটি ব্যাপার অবলম্বনের সুযোগ দেয়া হত, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তার মধ্যে 'সহজতম' পন্থাটি অবলম্বন করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৯৬)

কেননা কঠিন ও মুশকিল পন্থা অবলম্বনের দ্বারা পরোক্ষভাবে নিজ বাহাদুরী ও বীরত্বের দাবী করা হয় যে, "আমি তো ভীষণ বাহাদুর! তাইতো এত কঠিন পন্থাটি অবলম্বন করলাম"। অথচ 'সহজ পন্থা' অবলম্বনের দ্বারা নিজ দুর্বলতার প্রকাশ ঘটে।

অতএব যদি কিছু অর্জন করতে হয় তাহলে সেটা আল্লাহর গোলামী, আর বিনয় অবলম্বনের মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে, এটাই হল উন্নতির মূল সোপান।

এখনো চাল কাঁচা

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. এর মুখে মহান আল্লাহ বড় আশ্চর্যজনক তত্ত্বমূলক কথাবার্তা জারী করে দিতেন। একদিন তিনি বলছিলেন: যখন পোলাও পাকানো হয় তখন প্রথম প্রথম এ চালের মধ্যে খুব জোশ থাকে, তা থেকে আওয়াজ আসতে থাকে আর সেটা নড়াচড়া করতে থাকে। আর চালের এ জোশ মারতে থাকা-নড়াচড়া করতে থাকাটাই প্রমাণ যে চাল এখনো কাঁচা রয়েছে, পাকেনি, খাওয়ার উপযুক্ত হয়নি, তখন তার মধ্যে না থাকে কোন স্বাদ, না থাকে কোন সুঘ্রাণ। কিন্তু এ চালই যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে, তখন তার মধ্যে জোশও থাকে না, নড়াচড়াও থাকে না, থাকে না কোন আওয়াজ, বরং চাল বিলকুল চুপ হয়ে পড়ে থাকে; কিন্তু যেই ঢাকনা সরিয়ে দেয়া হয় তখনই পোলাও এর সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে।

ঠিক এমনিভাবে যখন মানুষ মনে করে যে, "আমি বড় জ্ঞানী, বড় নামাযী, মুত্তাকী, চাই তা মুখে বলুক বা অন্তরে বলুক, অতক্ষণ পর্যন্ত এ মানুষের মধ্যে কোন সুগন্ধিও নেই, স্বাদও নেই, বরং সে হল কাঁচা চালের ন্যায়। পক্ষান্তরে যেদিন সে বলবে যে, "আমি তো কিছুইনা। আমার তো কোন হাকীকতই নাই"। সেদিন থেকেই তাঁর সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে, মহান আল্লাহ তাঁর গুণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন।

এ প্রসঙ্গেই আমাদের হযরত আব্দুল হাই রহ. একটি চমৎকার কবিতা বলতেন-

میں عارفی آوارہ صحراء فنا ہوں
ایک عالم بے نام ونشاں میرے لئے ہے

অর্থাৎ আমি আরেফী, আমি বিনয় ময়দানের আওয়ারা। নাম নিশানাহীন এক জগৎ সে তো আমারই।

মহান আল্লাহ আমাদের কে এরূপ বিনয়ের তাউফীক দিন।

হযরত সায়্যিদ সুলাইমান নদভী রহ. এবং তাঁর বিনয়

হযরত সায়্যিদ সুলাইমান নদভী রহ. যাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার খ্যাতি সারা বিশ্বে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। নিজ ঘটনা শুনাচ্ছেন এভাবে-

"যখন আমি ছয় খণ্ডে "সীরাতুন নবী" সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাপ্ত করি; তখন বার বার অন্তরে এ চিন্তার উদ্রেক হত যে, যে মহান ব্যক্তির জীবনী লিখেছি, তাঁর জীবনের কোন প্রতিচ্ছবি বা ঝলক আমার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে হবে"।

তো এ মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। আর হাকীমুল উম্মাত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর কথা, তাঁর সুখ্যাতির কথাও যেহেতু কিছুটা শুনতে পেয়েছিলেন; ফলশ্রুতিতে তিনি থানাভবনে হযরত থানভী রহ. এর দরবারে চলে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং কয়েক দিন এখানে অবস্থান করেন। বিদায় নেয়ার সময় বলেন যে, "হযরত! আমাকে কিছু নসীহত করুন"।

হযরত থানভী রহ. বলেনঃ "তখন আমার চিন্তা হল যে, এত বড় বিদ্বান ব্যক্তি কে আমি কী নসীহত করব? যাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার খ্যাতি বিশ্বময় প্রচারিত। ফলশ্রুতিতে আমি মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম যে, হে আল্লাহ! আমার অন্তরে এমন কোন কথা ঢেলে দিন যা আমার জন্যও উপকারী হয় আর তাঁর জন্যও ফায়েদাজনক হয়"।

অতঃপর হযরত থানভী রহ. হযরত নদভী রহ. কে সম্বোধন করে বলেন যে, "ভাই! আমাদের এ পথে তো প্রথম ও শেষ কথাই হচ্ছেঃ "নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া"।

হযরত সায়্যিদ সুলাইমান নদভী রহ. বলেন যে, "হযরত থানভী রহ. উক্ত কথাটি বলার সময় স্বীয় হাত বুকের দিকে নিয়ে নিচে এমন ঝাঁকুনি দেন যে, আমার মনে হল যে, আমার বুকের মধ্যেও একটি ঝাঁকুনি লাগল"।

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. [যিনি হযরত থানভীর বিশিষ্ট খলীফা] বলেন যে, এ ঘটনার পর হযরত নদভী রহ. নিজেকে এমনভাবে মিটিয়ে দেন যে, তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

একদিন দেখা গেল যে, তিনি খানকার বাইরে মজলিসে আগত মানুষদের জুতা সোজা করছেন!

আসলে এ বিনয় ও নম্রতা মহান আল্লাহ তাঁর অন্তরে সৃষ্টি করেছেন। যার সুপ্রভাবে তাঁর সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মহান আল্লাহ তাঁকে কত উঁচু মর্যাদা দান করেছেন!!

"আমিত্ব"কে অন্তর থেকে বের করে দাও

যাই হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে "আমিত্ব" এর প্রভাব থাকবে, অতক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে হবে যে, চাল কাঁচা, তা এখনো পাকেনি। এ চাল তখনই সুবাসিত হবে; যখন "আমিত্ব" কে মিটিয়ে দেয়া হবে। এটাই মিটিয়ে দেওয়ার খোদাপ্রদত্ত বৈশিষ্ট্য। আর মিটিয়ে দেওয়ার অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজ চাল চলন তথা সর্বক্ষেত্রে "অহংকার" থেকে বেঁচে থাকবে ও বিনয় অবলম্বন করবে। আর যে দিনই মানুষ বিনয় অবলম্বন করবে, সে দিনই তাঁর সামনে হক্বের রাস্তা উন্মোচিত হবে। কেননা "হক্ব" পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা হচ্ছে 'অহংকার' এর বাঁধা। অহংকারী নিজেকে যতই বড় মনে করুক না কেন, আর মানুষদেরকে যতই ছোট মনে করুক না কেন, পরিশেষে আল্লাহ পাক বিনয়ী ব্যক্তিকেই সম্মানিত আর অহংকারী ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করবেন।

অহংকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত

আরবী ভাষায় একজন বড়ই জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছেন। তা হল এই যে; অহংকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পাহাড়ের নীচে চলমান ব্যক্তিদের কে ছোট মনে করছে; অথচ নীচ থেকে যারা তাকে দেখছে তারাও তাকে ছোটই মনে করছে।

ঠিক এমনিভাবে পুরো পৃথিবীবাসী অহংকারী ব্যক্তিকে তুচ্ছ মনে করে আর সে পৃথিবীর মানুষদেরকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করে। কিন্তু যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে মিটিয়ে দেয়, মহান আল্লাহ তাঁর ইযযত ও সম্মান বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও এ সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. এর বিনয়

আমাদের হযরত আব্দুল হাই রহ. বলতেন যে; "আমি আমার বাসায় কখনো কখনো খালি পায়ে চলি, যেহেতু হাদীসের একটি বর্ণনায় পেয়েছি যে, প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময়ে খালি পায়ে চলতেন; তো আমিও এ জন্যে খালি পায়ে চলি, যাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যায়"।

হযরত ডাক্তার সাহেব রহ. আরো বলতেন যে, "আমি খালি পায়ে চলার সময় নিজেকে সম্বোধন করে বলি: দেখ! তোমার হাকীকত তো এটাই যে, পায়ে জুতা নেই, মাথায় টুপি নেই, শরীরে পোশাক নেই; আর শেষ পর্যন্ত তুমি মাটিতেই মিশে যাবে।"

মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.-এর বিনয়

হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. আমাদের কে এ ঘটনা শুনিয়েছেন যে, একদা আমি রাবসন রোডের ডাক্তার খানায় বসা ছিলাম; সে সময় হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. ডাক্তার খানার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর ডানে, বামে বা সঙ্গে কেউ ছিলেন না। হাতে একটি পাত্র ছিল; তখন আমি আমার সামনে উপস্থিত ব্যক্তিদের কে বললাম যে, আপনারা জানেন কি ইনি কে? অতঃপর নিজেই বললাম যে, "ইনি হলেন পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম, যিনি নিজ হাতে পাত্র বহন করে চলছেন। অথচ, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথাবার্তায় কেউ বুঝতেই পারবে না যে তিনি কত বড় আলেম!!"

দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ. এর বিনয়

হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ. যিনি আমাদের সম্মানিত পিতা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর শিক্ষক

ও দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম ছিলেন; তাঁর ঘটনা আমি আমার সম্মানিত পিতার মুখে শুনেছি যে, তাঁর ঘরের আশে পাশে কয়েকজন বিধবার বাড়ী ছিল। তাঁর নিত্যদিনের পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি নিজ বাসভবন থেকে দারুল উলূম দেওবন্দে যাওয়ার জন্য বের হতেন, তখন প্রথমে ঐ বিধবাদের ঘরে যেতেন আর তাঁদের কে জিজ্ঞাসা করতেন যে, বাজার থেকে কোন সওদাপাতি আনার আছে কিনা?

তখন বিধবাগণ বাজার থেকে এ পরিমাণ ধনিয়া পাতা, এ পরিমাণ পেঁয়াজ, অতটুকু আলু, ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের ফরমায়েশ করতেন। আর তিনিও তাঁদের চাহিদা হিসেবে বাজার থেকে সে সব জিনিস এনে দিতেন।

অনেক সময় এমনটিও হত যে, সওদা আনার পর কোন বিধবা বলতেন যে, "মৌলভী ছাহেব! আপনি তো ভুল সওদা এনেছেন! জবাবে তিনি বলতেন যে, "কোন ব্যাপার নয়, আমি পুনরায় বাজারে গিয়ে তা এনে দিচ্ছি"। ফলশ্রুতিতে তিনি দ্বিতীয় বার বাজারে গিয়ে উদ্দিষ্ট বস্তু নিয়ে আসতেন।

অতঃপর "ফাতওয়া" লিখার জন্য দারুল উলূম যেতেন।

আমার সম্মানিত আব্বাজান রহ. বলতেন যেঃ এই যিনি বিধবাদের সওদা আনার জন্য বাজারে যাচ্ছেন, তিনিই হলেন হিন্দুস্থানের "মুফতীয়ে আযম"।

কেউ তাঁকে দেখে ভাবতেও পারবে না যে, ইনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পাহাড়। আজ তাঁর অপূর্ব বিনয়ের ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, তাঁর ফাতওয়া সম্বলিত বার খন্ডের বিশাল কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। যার উপর এখনো কাজ অব্যাহত আছে। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

আসল কথা সেটাই যে, তাঁর অনবদ্য কীর্তিই তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট আলামত, এই জিনিস মহান আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন।

তাঁর ইন্তিকালের ঘটনাও আশ্চর্যজনক। ইন্তিকালের সময়ও তাঁর হাতে একটি ফতোয়া ছিল, এবং ফতোয়া লিখা অবস্থাতেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়।

হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী রহ. এর বিনয়

হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী রহ. যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সম্বন্ধে লিখা হয়েছে যে, তিনি সর্বক্ষণ একটি লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় থাকতেন। আর সাধারণ মানের কুর্তা পরিধান করতেন।

কেউ তাঁকে দেখে বুঝতেই পারতনা যে, তিনি এত উঁচু ও বড় আলেম। যিনি বিতর্কের সময় বড় বড় পণ্ডিতদের কেও অনায়াসে নিস্তব্ধ করে দিতে পারতেন। অথচ তাঁর সারল্য ও বিনয়ের অবস্থা ছিল এই যে, লুঙ্গী পরিধান করে মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছেন।

যেহেতু তিনি ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন; সেজন্য ইংরেজদের তরফ থেকে তাঁর উপর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়ে গিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে একদিন একজন লোক তাঁকে গ্রেফতারের জন্য আসে। কেউ তাকে বলে দেয় যে, তিনি ছাত্তা মসজিদে অবস্থান করছেন। ঐ ব্যক্তি মসজিদে পৌঁছে দেখে যে, জনৈক ব্যক্তি লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছেন।

এখন যেহেতু গ্রেফতারী পরোয়ানায় এটা লিখা ছিল যে, "মাওলানা কাসেম নানূতবীকে গ্রেফতার করা হোক।" সে জন্য যে ব্যক্তি গ্রেফতার করতে এসেছিল সে ভাবছিল যে, তিনি তো জুব্বা ও দামী কাপড়ে সজ্জিত বড় আল্লামা হবেন, যিনি এত বড় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার কল্পনাতেও আসেনি যে, যিনি মসজিদ ঝাড়ু দিচ্ছেন তিনিই মাওলানা কাসেম নানূতবী! বরং ঐ লোক ভেবেছিল যে, ইনি মসজিদের খাদিম!!

যাই হোক ঐ ব্যক্তি স্বয়ং নানূতবী রহ.কেই জিজ্ঞেস করে যে, "মাওলানা কাসেম ছাহেব কোথায়?"

এদিকে গ্রেফতারীর ব্যাপারে যেহেতু খোদ মাওলানা অবগত ছিলেন আর আত্মগোপন করাও জরুরী ছিল; সাথে সাথে কথা যাতে মিথ্যা না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়, এসব কারণে তিনি যে স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে এক পা পিছু হটে উত্তর প্রদান করেন যে, "এইতো একটু পূর্বে এখানে ছিলেন"!!

ফলে ঐ ব্যক্তি এটাই বুঝে নেয় যে, তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে ছিলেন এখন উপস্থিত নেই। ফলে সে খোঁজ করতে করতে ফিরে চলে যায়।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী রহ. বলতেনঃ "যদি জ্ঞানের দুটি অক্ষরের তোহমত মুহাম্মাদ কাসেমের নামে না থাকত, তাহলে পৃথিবী জানতেই পারত না যে, কাসেম কোথায় পয়দা হয়েছে? আর কোথায় মৃত্যুবরণ করেছে"?

এরকম অতুলনীয় বিনয়ের সাথে তিনি নিজ জীবন অতিবাহিত করেছেন।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর বিনয়

আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মুগীছ ছাহেব রহ. এর নিকট থেকে এ ঘটনা শুনেছেন যে, হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব রহ. যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে পুরো ভারতবর্ষ-আফগানিস্তান ও তুরস্ক উত্তাল করে রেখেছিলেন, যাঁর সুখ্যাতি ছিল পুরো দেশজুড়ে।

তাঁর প্রসঙ্গেই একটি ঘটনা। একদা আজমীরের আলেম মাওলানা মুঈনুদ্দীন আজমীরী রহ. এর ইচ্ছা হল, দেওবন্দে গিয়ে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর সঙ্গে মুলাকাত করবেন। ফলে তিনি ট্রেনে করে দেওবন্দ পৌঁছেন এবং সেখানের একজন টাঙ্গাওয়ালা কে বলেন যে, "আমি হযরত শাইখুল হিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যেতে চাই"।

স্মর্তব্য যে, যদিও সমগ্র পৃথিবীতে তিনি "শাইখুল হিন্দ" নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন; কিন্তু দেওবন্দে তিনি "বড় মৌলভী ছাহেব" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

টাঙ্গাওয়ালা জিজ্ঞেস করেন যে, "বড় মৌলভী" ছাহেবের নিকট যেতে চাচ্ছেন কি? প্রতিউত্তরে তিনি বলেন যে, হ্যাঁ বড় মৌলভী ছাহেবের নিকট যেতে চাচ্ছি। ফলে টাঙ্গাওয়ালা তাঁকে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর বাসায় নামিয়ে দিয়ে যায়।

গ্রীষ্মকাল ছিল। দরজায় কড়া নাড়ার পর গেঞ্জী ও লুঙ্গী পরিহিত এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসেন। আগন্তুক মাওলানা বলেন যে, আমি শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব এর সঙ্গে দেখা করার জন্য আজমীর থেকে এসেছি, আমার নাম মুঈনুদ্দীন। তখন ঐ লুঙ্গী পরিহিত ব্যক্তি বলেন যে; জী আসুন! বসুন!

তিনি বসার পর পুনরায় বলতে থাকেন যে, "আপনি হযরত মাওলানা কে সংবাদ দিন যে, মুঈনুদ্দীন আজমিরী আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছেন"। কিন্তু মেযবান ছাহেব বলতে থাকেন যে, আপনি গরমের মধ্যে এসেছেন, বসুন। এ বলে পাংখা দিয়ে বাতাস করা আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পর আজমীরী মাওলানা আবার বলেন যে, আপনি হযরত কে আমার আগমনের সংবাদ দিন। তিনি বলেন যেঃ হ্যাঁ, এখনই সংবাদ দিচ্ছি। এ কথা বলে খানা নিয়ে আসেন। আগন্তুক আজমীরী আলেম বলেন যেঃ ভাই! আমি এখানে খানা খাওয়ার জন্য আসিনি, আমি তো মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। তাঁর সাথে আমাকে সাক্ষাত করিয়ে দিন!! কিন্তু মেযবান বলেন : খানা খেয়ে নিন; এখনই সাক্ষাত করিয়ে দিচ্ছি। ফলে খানা খাওয়ান, পানি পান করান।

এভাবে এক পর্যায়ে মাওলানা মুঈনুদ্দীন আজমীরী রহ. বিরক্ত হয়ে পড়লে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বলেন যে, "ভাই! কথা হল এই যে, এখানে "শাইখুল হিন্দ" নামে তো কেউ থাকে না; অবশ্য বান্দা মাহমূদ এ অধমেরই নাম"!

তখন মাওলানা মুঈনুদ্দীন ছাহেব রহ. বুঝতে সক্ষম হন যে, "শাইখুল হিন্দ" খ্যাত মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব ইনিই, যাঁর সাথে তিনি এতক্ষণ রাগের সঙ্গে ঝাঁজ মিলিয়ে কথা বলছিলেন।

এটাই ছিল আমাদের পূর্বসূরী বুযুর্গদের বিনয় এর রং।

আল্লাহ তা'আলা তার কিছু অংশ আমাদেরকেও দান করুন। আমীন।

হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ.-এর বিনয়

প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব কান্ধলভী রহ. একদা কোন স্থান থেকে কান্ধলায় ফিরছিলেন। রেলগাড়ী থেকে কান্ধলা ষ্টেশনে নেমে তিনি দেখতে পান যে, জনৈক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি মাথায় সামান উঠিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। কিন্তু বোঝার ভারে চলতে পারছেন না। হযরত মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ. চিন্তা করলেন যে, বেচারা বৃদ্ধ মানুষ কষ্ট করছে! ফলে তিনি ঐ বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন যে, "আমি কি আপনার সামানার কিছু বহন করতে পারি? যদি অনুমতি দেন তাহলে আমিও কিছু অংশ উঠাব"।

প্রতিউত্তরে ঐ বৃদ্ধ বললেন যে, আপনার অনেক শুকরিয়া। আপনি কিছু অংশ উঠালে তো ভালই হয়।

যাই হোক, অতঃপর মাওলানা মুযাফফর হুসাইন ছাহেব রহ. তাঁর সামান মাথায় উঠিয়ে শহর অভিমুখে রওয়ানা করেন। চলতে চলতে রাস্তায় কথা আরম্ভ হয়। মাওলানা ঐ বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কোথায় যেতে চাচ্ছেন? তিনি বলেন যে, কান্ধলায় যেতে চাচ্ছি। মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন, কেন? জবাবে বৃদ্ধ বললেন যে: শুনেছি সেখানে একজন বড় মৌলভী ছাহেব আছেন, তাঁর নিকট যেতে চাচ্ছি। মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন যে, সে বড় মৌলভী ছাহেব কে? বৃদ্ধ বললেন যে, "মাওলানা মুযাফফার হুসাইন কান্ধলভী", শুনেছি

তিনি অনেক বড় আলেম ও মাওলানা। তখন মাওলানা (মুযাফফার হুসাইন ছাহেব) বললেন যে হ্যাঁ, সে কিছু আরবী জানে বটে।

এভাবে কথা বলতে বলতে তাঁরা কান্ধলার নিকট চলে আসেন। কান্ধলার সকলেই যেহেতু মাওলানা কে চিনতেন, সেহেতু তাঁরা মাওলানা কে ঐ বৃদ্ধের বোঝা বহন করতে দেখে তাঁর সম্মানার্থে তাঁর দিকে দৌড়ে আসেন।

এদিকে এ বৃদ্ধ ব্যক্তির তো করুণ অবস্থা, তিনি এ ভেবে ভীষণ পেরেশান হচ্ছিলেন যে, হায়! আমি এতবড় আলেমের উপর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মাওলানা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে,জনাব! পেরেশানীর কিছু নেই; আমি দেখলাম যে, আপনি কষ্ট করছেন। আল্লাহ পাক আমাকে খিদমতের তাউফীক দিয়েছেন। সমস্ত শুকরিয়া তাঁরই।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর বিনয়ের আরেকটি ঘটনা

হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব রহ. এর রামাযান মাসের পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, ইশার পর তারাবীহ শুরু হয়ে ফজর পর্যন্ত অর্থাৎ সারা রাত চলত, প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ দিন কুরআন খতম হত। জনৈক হাফেয ছাহেব তারাবীহ পড়াতেন আর হযরত মাওলানা পিছনে দাঁড়িয়ে শুনতেন। হযরত নিজে হাফেয ছিলেন না। তারাবীহ শেষে হাফেয ছাহেব সেখানেই হযরতের নিকট কিছুক্ষণের জন্য শুয়ে যেতেন।

হাফেয ছাহেব বলছেন যে, একদিন আমার চক্ষু খোলার পর দেখি যে, কেউ আমার পা দাবিয়ে দিচ্ছে। আমি প্রথমে ভাবলাম যে, আমার কোন শাগরেদ বা ছাত্র ভাই হবে, ফলে আমি আর তাকিয়ে দেখিনি যে, কে দাবাচ্ছে? বেশ কিছুক্ষণ পর পাশ ফিরে দেখি যে, হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব আমার পা দাবিয়ে দিচ্ছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে পড়ি, আর বলি যে,

হযরত! এটা আপনি কী করলেন? হযরত বললেন যে, “আরে; এটা বিশেষ কী হল? তুমি সারারাত তারাবীহতে দাঁড়িয়ে থাক; তাই আমি ভাবলাম যে, পা দাবিয়ে দিলে তোমার পায়ে আরাম লাগবে, এ জন্যই দাবিয়ে দিচ্ছিলাম”!!

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়া‘কূব নানূতবী ছাহেব রহ. এর বিনয়

হযরত মাওলানা ইয়া‘কূব নানূতবী রহ. যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের “সাদরুল মুদাররিসীন” বা প্রধান শিক্ষক ছিলেন, অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের আলেম ছিলেন।

তাঁর ব্যাপারে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. একটি ওয়াযে বলেছেন যে, তাঁর নিয়ম ছিল এই যে, যখন কেউ তাঁর সামনে তাঁর প্রশংসা শুরু করত তখন তিনি একদম চুপ থাকতেন। কিছুই বলতেন না, যেমনটি আজকাল আমরা বানোয়াটি বিনয় অবলম্বন করি অর্থাৎ কেউ আমাদের প্রশংসা করলে বলি যে, “এটা তো আপনার সুধারণা; নতুবা আমি তো এর উপযুক্ত নই” ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ দিলে দিলে খুবই খুশী হই যে,এ ব্যক্তি আমার আরো প্রশংসা করুক! আর নিজকেও বড় ভাবতে থাকি! আসলে এটা হল লৌকিকতামূলক বিনয় যেটা ‘বাস্তব-বিনয়’ নয়।

যাই হোক। হযরত ইয়া‘কূব নানূতবী রহ. একদম চুপ থাকতেন। এখন দর্শকগণ এটা ভাবত যে, হযরত নিজ প্রশংসায় খুশী হচ্ছেন, নিজ প্রশংসাই তাঁর কাম্য। সেজন্যই তো কাউকে বাঁধা দিচ্ছেন না।

হযরত থানভী রহ. বলেন যে, এখন দেখনেওয়ালা বা দর্শক যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে মনে করবে যে, তাঁর মধ্যে বিনয় নেই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ সব লৌকিকতা সর্বস্ব বিনয়ের নাম বিনয় নয়। বরং বিনয় তো অন্তরের ভিতর থাকে যার আলামত হল এই যে, মানুষ কখনো কোন কাজকে নিজের জন্য অবমাননাকর বা নীচু মনে করে না।

তাঁর বিনয়ের আরেকটি ঘটনা

একদা জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁকে খানার দাওয়াত দিয়েছিলেন। তিনি তা কবূলও করেন, এদিকে ঐ ব্যক্তির গ্রাম ছিল বেশ দূরে। কিন্তু সে সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা না রাখায় হযরত রহ. কে পদব্রজেই রওয়ানা দিতে হয়। ঐ ব্যক্তি সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা না করা সত্বেও হযরত রহ. অন্তরে সামান্য কষ্টও অনুভব করেননি। যাই হোক হযরত রহ. তার ঘরে পৌঁছে খানা খেলেন, কিছু আমও খেলেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, প্রত্যাবর্তনের সময়ও সে ব্যক্তি সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা রাখেনি। শুধু তাই নয়, উপরন্তু প্রচুর পরিমাণ আমের একটি বোঝা হযরতের কাঁধে চাপিয়ে দেয় এবং বলে যে, হযরত! কিছু আম আপনার ঘরের জন্য নিয়ে যান। হযরত তা কবূল করে নেন। এবং সেটা নিয়েই রওয়ানা দেন।

এদিকে হযরতের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি সমগ্র জীবন কাটিয়েছেন শাহযাদার বেশে, এত ভারী বোঝা তিনি কখনও উঠাননি। তাই অবস্থা হল এই যে, ঐ বোঝাটি কখনও ডান হাতে আবার কখনও বাম হাতে নিচ্ছিলেন। এভাবে যখন দেওবন্দের নিকটে চলে আসেন, তখন ব্যথায় হযরতের উভয় হাত চুরচুর হয়ে গিয়েছিল। পরিশেষে ঐ বোঝা কে উঠিয়ে নিজের মাথায় রাখেন, মাথায় রাখার পর হাত কিছুটা আরাম পায়। নিজেই বলা আরম্ভ করেন, "আমিও এক আজব মানুষ; প্রথমেই তো আমার খেয়াল করা উচিত ছিল যাতে বোঝাটি মাথায় নেয়া যায়, তাহলেই তো আর এত কষ্ট লাগত না"।

এখন মাওলানা এ অবস্থায় দেওবন্দে প্রবেশ করছেন যে, তাঁর মাথায় আমের বোঝা, এদিকে রাস্তায় যে লোকের সাথেই দেখা হচ্ছে তিনিই সালাম করছেন, মুসাফাহা করছেন, আর হযরত এক হাতে বোঝা ধরে অপর হাতে মুসাফাহা করছেন। এ অবস্থাতেই হযরত নিজ বাড়ীতে পৌঁছেন। কিন্তু হযরতের মনে এ কথার সামান্যতম চিন্তাও আসেনি যে, এ কাজ আমার শানের, আমার মর্যাদার পরিপন্থী।

যাই হোক, মানুষ কখনও কোন কাজ কে নিজ মর্যাদাহানির কারণ ভাববে না। এটাই হল বিনয়ের আলামত।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

হযরত সায়্যিদ আহমাদ কবীর রেফায়ী রহ. এর নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। তিনি অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের ওলী ও বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সাথে এমন একটি আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যা পৃথিবীর আর কারো সাথে হয়নি। সেটা হল এই যে, তাঁর সমগ্র জীবনে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের রওযা মুবারকে হাযিরী ও উপস্থিতির আকাংখা ছিল। দারুণ আকাংখার পর মহান আল্লাহ তাঁকে হজ্বের সৌভাগ্য দান করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মুবারকে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাৎক্ষণিক ভাবে আরবী এ দুটো কবিতা তাঁর মুখ হতে নিঃসৃত হয়।

فِيْ حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِيْ كُنْتُ أُرْسِلُهَا
تُقَبِّلَ الْأَرْضَ عَنِّيْ وَهِيَ نَائِبَتِيْ
وَهٰذِهٖ دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ
فَامْدُدْ يَمِيْنَكَ كَيْ تَحْظٰى بِهَا شَفَتِيْ

অর্থাৎ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! "যখন আমি আপনার থেকে দূরে ছিলাম, তখন আমি রওযা শরীফে আমার রূহ পাঠাতাম, সে আমার প্রতিনিধি হয়ে এসে জমিনকে চুম্বন করত। আর আজ যখন আল্লাহর রহমতে শারীরিক ভাবে আমার উপস্থিতির সুযোগ হয়েছে, সেহেতু আপনি (মেহেরবানী করে) আপনার মুবারক হাত বাড়িয়ে দিন; যাতে আমার ঠোঁট তাতে সিক্ত ও ধন্য হতে পারে"।

এ কবিতা পাঠ করা মাত্রই রওযা শরীফ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মুবারক বেরিয়ে পড়ে, এবং যত মানুষ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই সে হাত মুবারকের

যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হন। আর সায়্যিদ আহমাদ কবীর রেফায়ী রহ. সে পবিত্র হাতে চুম্বন করেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী হাত ভিতরে ঢুকে যায়।

এখন হাকীকত বা বাস্তবতা কী? তাতো মহান আল্লাহই ভালো জানেন। তবে ইতিহাসে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

অহংকারের চিকিৎসা

এ ঘটনার পর সায়্যিদ আহমাদ কবীর রেফায়ী রহ. এর দিলেও খেয়াল আসে যে, আজ মহান আল্লাহ আমাকে এত বড় সৌভাগ্যে ধন্য করেছেন যে সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত আর কারো হয়নি। আবার এমনটি যেন না হয় যে, আমার অন্তরে তাকাব্বুর ও অহংকারের গন্ধ আসা শুরু হয়ে গেল।

ফলে তিনি মসজিদে নববীর দরজায় শুয়ে পড়েন, আর উপস্থিত মানুষদেরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, "আমি আপনাদেরকে কসম করে বলছি, আপনারা সকলেই আমার উপর দিয়ে মাড়িয়ে বাইরে বের হন; যাতে অহংকারের এ আশংকাও দূর হয়ে যায়"।

এভাবেই তিনি অহংকারের চিকিৎসা করেছেন। ঘটনাটি তো আমি কথা প্রসঙ্গে বলে ফেললাম। নতুবা আমার আসল ঘটনা বলার ছিল এই যে,

আল্লাহর সৃষ্টি সেবার অপূর্ব নমূনা

একদা হযরত সায়্যিদ আহমাদ কবীর রেফায়ী রহ. বাজারে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে একটি রোগগ্রস্থ কুকুর দেখলেন। যে কুকুরটি রোগের দরূন চলতেও পারছিল না। আসলে যাঁরা আল্লাহর নেক বান্দা হন তাঁদের মহান আল্লাহর মাখলূক ও সৃষ্টিজীবের সাথেও অত্যন্ত স্নেহও মহব্বত থাকে। এ মহব্বত ও ভালবাসা এটারই নিদর্শন যে,

আল্লাহর সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এটাকেই মাওলানা রুমী রহ. বলেছেন-

ز تسبیح و سجاده و دلق نیست
طریقت بجز خدمت خلق نیست

অর্থাৎ তাসবীহ, জায়নামায আর কাপড়ে তালি দেয়ার নাম তরীকত নয়, বরং খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবার নামই হল তরীকত।

আমার শাইখ হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন: "যখন কোন বান্দা আল্লাহকে মহব্বত করে, আর আল্লাহ পাকও তাঁকে মহব্বত করেন, তখন মহান আল্লাহ তাঁর অন্তরে মাখলূকের মহব্বত ঢেলে দেন। যার বদৌলতে মানুষ বরং জীবজন্তু ও প্রাণীদের সাথেও সে মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়, যা আমি ও আপনি কল্পনাও করতে পারব না"।

যাই হোক, যখন হযরত সায়্যিদ আহমাদ কবীর রেফায়ী রহ. কুকুরটি কে ঐ করুণ অবস্থায় দেখেন, তখন তাঁর অন্তরে রহম ও দয়া উথলে উঠে এবং তিনি সে কুকুরটিকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে আসেন। অতঃপর ডাক্তার ডেকে তার চিকিৎসা করান, ঔষধ দেন এবং এভাবে কয়েক মাস পর্যন্ত চিকিৎসা করান।

মহান আল্লাহ কুকুরটিকে সুস্থতা দান করলে তিনি নিজ জনৈক সঙ্গীকে বলেন যে, "যদি কেউ প্রত্যহ এটাকে খাওয়ানোর যিম্মাদারী নিতে পারে তাহলে সে এ কুকুরটিকে নিয়ে যাক, নতুবা আমিই এটার দেখাশুনা করব এবং এটাকে খাওয়াব"।

এভাবে তিনি সে কুকুরটিকে প্রতিপালন করেন।

একটি কুকুরের সঙ্গে কথোপকথন

এ ঘটনার পর একদিন সায়্যিদ আহমাদ কবীর রেফায়ী রহ. কোথাও তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। বর্ষাকাল ছিল। ক্ষেতের মধ্যে যে সরু পথ থাকে সেটার উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। উভয় পার্শ্বে পানি ও কাদা (প্যাঁক) ছিল। চলন্ত অবস্থায় ঐ সরুপথে একটি কুকুর তাঁর

সামনে এসে পড়ে, ফলে তিনিও থেমে যান আর কুকুরও থেমে যায়; আর ঐ সরু পথটি এতই সংকীর্ণ ছিল যে, এক সঙ্গে শুধু মাত্র একজন মানুষই তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারত, দু'জন পারত না। এখন শুধু দু'টি পন্থা ছিল। এক: হয় কুকুর নীচে নেমে কাদার মধ্য দিয়ে যাবে আর তিনি উপর দিয়ে যাবেন। দুই: তিনি কাদার মধ্য দিয়ে যাবেন আর কুকুরটি উপর দিয়ে যাবে। এখন তিনি দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন যে, কী করবেন? আমি নীচে নামব? নাকি কুকুর নীচে নামবে? তো সে সময় সায়্যিদ আহমাদ কবীর রেফায়ী রহ. এর ঐ কুকুরটির সঙ্গে কথোপকথন হয়।

[মহান আল্লাহই ভাল জানেন সে কথোপকথন কিভাবে হয়েছে? হতে পারে মহান আল্লাহ কারামত হিসেবে সে কুকুরটিকে কিছুক্ষণের জন্য কথা বলার শক্তি দান করেছেন এবং বাস্তবিক পক্ষেই কথাবার্তা হয়েছে, এবং এটাও হতে পারে যে, তিনি মনে মনে এ কথোপকথন করেছেন।]

যাই হোক, এ কথোপকথনে হযরত সায়্যিদ আহমাদ কবীর রহ. কুকুরটিকে বলেন যে, "তুমি নীচে নাম, যাতে আমি উপর দিয়ে যেতে পারি"।

প্রতিউত্তরে কুকুরটি বলে যে, আমি নীচে নামব কেন? আপনি তো বেশ বড় দরবেশ আর আল্লাহর ওলী হয়ে ঘুরছেন, আর আল্লাহর ওলীদের হালত তো এই হয় যে, তাঁরা অপরকে নিজের উপর প্রাধান্য দানে মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকেন, তাঁরা অপরের জন্য কুরবানী পেশ করেন, আপনি কেমন ওলী যে, আমাকে নামার নির্দেশ দিচ্ছেন? নিজে নামছেন না?

এর উত্তরে শাইখ রেফায়ী রহ. বলেন যে, "আসল কথা হল আমার আর তোমার মাঝে পার্থক্য আছে। সেটা হল এই যে, আমি মুকাললাফ (যার উপর শরীয়তের বিধিবিধান প্রযোজ্য) আর তুমি গাইরে মুকাললাফ, আমাকে নামায পড়তে হয়। কিন্তু তোমার শরীর নাপাক হলে তোমার গোসল বা পবিত্রতার প্রয়োজন হবে না;

পক্ষান্তরে আমি নামলে আমার কাপড় নাপাক হবে এবং আমার নামায-ইবাদতে অসুবিধা দেখা দিবে। এ জন্যই আমি তোমাকে বলছি যে, তুমি নীচে নেমে যাও"।

এর জবাবে কুকুরটি বলল যে, "ওহ! আপনি তো দেখছি দারুণ আশ্চর্যজনক কথা বললেন যে, কাপড় নোংরা হয়ে যাবে! আরে যদি আপনার কাপড় নোংরা হয় তাহলে তার ব্যবস্থা হল তা খুলে ধুয়ে ফেলা, তবেই কাপড়টি পাক হয়ে যাবে কিন্তু যদি আমি নীচে নেমে যাই তাহলে এ সূরতে সমস্যা হল এই যে, আপনার দিল নোংরা হয়ে যাবে! এবং আপনার দিলে এ খেয়াল আসবে যে, আমি কুকুরটি অপেক্ষা ভাল, যেহেতু আমি "মানুষ"। আর এ খেয়ালের দরূন আপনার দিল ও অন্তর এতই নোংরা হবে যে, তা পাক করার আর কোন উপায় নেই। সে জন্য ভাল পথ এটাই যে অন্তর নোংরা না করে কাপড় কে নোংরা করে নীচে নেমে যান।"

ব্যস! কুকুরের এ উত্তর শ্রবণ করে শাইখ রেফায়ী রহ. বললেন যে, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ; কাপড় দ্বিতীয়বার ধৌত করা যায়; কিন্তু দিলের ক্ষেত্রে তা হয় না। এ কথা বলে তিনি কাদায় নেমে পড়েন আর কুকুরকে রাস্তা দিয়ে দেন।

এ কথোপকথনের পর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত সায়্যিদ আহমাদ কবীর রেফায়ী রহ. এর উপর ইলহাম হল যে, "হে আহমাদ কবীর! আজ আমি তোমাকে এমন একটি জ্ঞানের দৌলত দান করেছি যে, সমস্ত জ্ঞান এক দিকে আর এ জ্ঞান একদিকে। আর বাস্তবিকপক্ষে এটা তোমার ঐ আমলের পুরস্কার, যে আমল তুমি কিছুদিন পূর্বে কুকুরের প্রতি দয়া করে তার চিকিৎসা ও দেখাশুনার মাধ্যমে অর্জন করেছ। সে আমলের বদৌলতেই আমি তোমাকে একটি কুকুরের মাধ্যমে ঐ জ্ঞান দান করেছি যার উপর অন্য সমস্ত জ্ঞান কুরবান। আর সে ইলম বা জ্ঞান হচ্ছেঃ মানুষ যেন নিজেকে কুকুর অপেক্ষা উত্তম বা উৎকৃষ্ট মনে না করে। আর কুকুর কে নিজের চেয়ে অধম বা নিকৃষ্ট মনে না করে।

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ.

প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ. এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাঁর ইন্তিকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্ন দেখে জিজ্ঞেস করেন যে, হযরত! মহান আল্লাহ আপনার সাথে কী মু'আমালা (ব্যবহার) করেছেন? প্রতিউত্তরে তিনি বলেন যে, বড় আজব ব্যবহার করেছেন। মহান আল্লাহর নিকট পৌঁছার পর আল্লাহ পাক আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, কী আমল নিয়ে এসেছ? আমি চিন্তা করছিলাম যে কী উত্তর দিব? নিজের কোন্ আমলই বা পেশ করব? কেননা পেশ করার মত কোন আমলই আমার ছিল না। এজন্য আমি উত্তর দিলাম, "হে আল্লাহ! কিছুই আনতে পারিনি, রিক্ত হাতে এসেছি, আপনার অনুগ্রহ ছাড়া আমার আর কিছুই নেই"।

তখন মহান আল্লাহ বলেন : "এমনিতে তো তুমি বড় বড় আমল করেছ। তবে তোমার একটি আমল আমার বড়ই পসন্দ হয়েছে, আজ ঐ আমলের বদৌলতেই আমি তোমাকে ক্ষমা করছি। সে আমলটি হল এই যে, এক রাতে তুমি উঠে দেখলে যে, একটি বিড়ালছানা শীতে কাঁপছে, তুমি সেটার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে নিজ কম্বলের নীচে জায়গা দিয়েছিলে এবং তার শীত দূর করে দিয়েছিলে, ফলে সে বিড়ালছানাটি বাকী রাতটুকু আরামের সাথে কাটাল; যেহেতু তোমার আমল ইখলাসে পূর্ণ ছিল, আমাকে রাযী করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য তোমার ছিল না, এ জন্য তোমার আমলটি আমার এতই পসন্দ হয়েছে যে, এ আমলের বদৌলতে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি"।

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী রহ. ইরশাদ করেন যে, পৃথিবীতে যে সব ইলম ও জ্ঞান অর্জন করেছিলাম তা ঐ পৃথিবীতেই রয়ে গেছে। সেখানে শুধু একটি আমলই মাকবূল হয়েছে আর তা হল "মাখলূকের সাথে সুন্দর ব্যবহার"।

সার কথা

যাই হোক, হযরত সায়্যিদ আহমাদ রেফায়ী রহ. কে ঐ ইলহামের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, ঐ সমস্ত জ্ঞান একদিকে আর এ কথার জ্ঞান

যে "আমি কিছুই না" "আমার হাকীকতই নেই"। এটাই সমস্ত উলূমের জান, যা আজ আমি তোমাকে দান করলাম। এটার নামই "বিনয়"।

সমস্ত বড় বড় ওলীগণ এ চিন্তায় লেগে থাকতেন যে, নিজের মধ্যে যেন অহংকারের আভাসও পয়দা না হয়।

"বিনয়" ও "হীনমন্যতা"য় পার্থক্য

ইদানীং "ইলমে নফসিয়াত" (মনোবিজ্ঞান) এর বেশ জোর দেখা যাচ্ছে। আর এ ইলমে নফসিয়াতের একটি বিষয় হল "হীনমন্যতা"; যেটাকে খুবই খারাপ মনে করা হয়। কারো মধ্যে এ ব্যাধি সৃষ্টি হলে তার চিকিৎসা করা হয়।

জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, যখন আপনি লোকদেরকে বলেন, "নিজেকে মিটাও"; এর দ্বারা তো পরোক্ষভাবে আপনি লোকদের মধ্যে "হীনমন্যতা" সৃষ্টি করে থাকেন! তবে কি, লোকেরা নিজেদের মধ্যে "হীনমন্যতা" ও "অনুভূতির স্বল্পতা" সৃষ্টি করবে?

আসল কথা হল "বিনয়" ও "হীনমন্যতার" মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম কথা হল যারা "ইলমে নফসিয়াত" আবিষ্কার করেছে, তাদের দ্বীনের জ্ঞান বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে কোন ইলমই ছিল না। ব্যস, তারা "হীনমন্যতা" নামক একটি শব্দ বানিয়ে নিয়েছে। অথচ বাস্তবিক পক্ষে "বিনয়" ও "হীনমন্যতায়" পার্থক্য রয়েছে।

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, "হীনমন্যতার" মধ্যে মহান আল্লাহর সৃষ্টির উপর অভিযোগ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে মানুষের মনে এ খেয়াল আসে যে, আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে, আমি আরো বেশির উপযুক্ত ছিলাম, কিন্তু পেয়েছি কম! অথবা এ অনুভূতি যে, আমাকে কুৎসিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাকে অসুস্থ করে দেয়া হয়েছে! আমাকে সম্পদ কম দেয়া হয়েছে! আমার মর্যাদা কম রাখা হয়েছে!! ইত্যাদি জাতীয় অভিযোগ

তার অন্তরে সৃষ্টি হয়। আর এ জাতীয় অভিযোগের অনিবার্য পরিণতি এটাই হয় যে, তার মন মানসিকতায় যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, আর পরবর্তীতে এ হীনমন্যতার বিষফলে মানুষ অন্যের সাথে হিংসা করতে থাকে এবং তার মধ্যে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়। সে ভাবতে থাকে "আমার দ্বারা কিছুই হবে না"।

সার কথা হল, এ হীনমন্যতার বুনিয়াদ বা ভিত্তি মহান আল্লাহর তাকদীরের উপর অভিযোগের কারণে হয়ে থাকে।

"বিনয়" হল "শোকর" (কৃতজ্ঞতা) এর ফলাফল

পক্ষান্তরে "বিনয়" হল এমন এক বস্তু, যা আল্লাহ পাকের তাকদীরের উপর অভিযোগ করার দ্বারা হাসিল হয় না, বরং মহান আল্লাহর বিভিন্ন পুরস্কারের উপর শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায়ের ফলাফলে অর্জিত হয়। বিনয়ী ব্যক্তি চিন্তা করেন যে, আমি তো এ নিয়ামতের উপযুক্ত ছিলাম না, কিন্তু মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাকে এ নিয়ামত দান করেছেন, এটা একান্তই তাঁর বিশেষ দান ও করুণা।

এর মাধ্যমেই আন্দাজ করুন "হীনমন্যতা" ও "বিনয়ের" মধ্যে কত পার্থক্য!! এ জন্য বিনয় হল মাহবূব বা পসন্দনীয় একটি কাজ।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করবে মহান আল্লাহ তাঁকে উঁচু মর্যাদা দান করবেন"।

(সহীহ মুসলিম ২ : ৩২১; সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫২)

"তাকাববুর" বা "অহংকারের" বিশেষত্ব হল এই যে, অহংকারকারী শেষ পর্যন্ত অপদস্থ হয়। আর "তাওয়াযু" বা "বিনয়ের" বৈশিষ্ট্য এই যে, বিনয়ী ব্যক্তি ইযযত ও সম্মান লাভ করে থাকেন। তবে শর্ত হল মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও বানোয়াটি বিনয় না হয়ে তা প্রকৃত বিনয় হতে হবে।

লোক দেখানো "বিনয়"

অনেক সময় আমরা মুখে মুখে এ জাতীয় বাক্য বলে থাকি যে, "আমাদের হাকীকত কি"? "আরে আমি তো নাচীজ" "নাকারা" "আহকার" ইত্যাদি! আসলে অধিকাংশ সময় এগুলো বিনয় তো হয়ই না; বরং বিনয়ের অভিনয় ও ধোঁকাবাজী হয়।

হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. ইরশাদ করতেন; "ব্যাপারটির প্রকৃত রহস্য বের করা খুবই সহজ। তা হল এই যে, যখন কেউ বলবে "আমি তো নাচীজ, নাকারা, গুনাহগার"। যদি আপনি তখন বলেন যে, নিশ্চয়ই আপনি বিলকুল সঠিক কথা বলেছেন, আপনি আসলেই বড় "নাচীজ" "গুনাহগার" "খতাকার"; এবার দেখুন! ঐ ব্যক্তি কী বলেন ? যদি তিনি অন্তর থেকেই এগুলো বলে থাকেন তবে তো কিছুই মনে নিবেন না। কিন্তু যদি তার অন্তরে খারাপ লাগে, ব্যথা লাগে, তবে বুঝতে হবে যে, তিনি অন্তর থেকে কথাগুলো বলেননি, বরং তিনি বিনয়সূচক শব্দগুলো শুধু এ জন্যই ব্যবহার করেছেন যাতে তাকে প্রতিউত্তরে বলা হয় যে, না হযরত! আপনি তো খুবই ভাল মানুষ! মুত্তাকী মানুষ! বড় পরহেযগার!

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, লৌকিকতা মূলক বানোয়াট বিনয়ের ক্ষেত্রে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়, তা সত্য দিলে বলা হয় না; বরং অন্যের থেকে নিজের প্রশংসা শোনার জন্য এগুলো বলা হয়; কাজেই এটা বিনয় হতে পারে না।

নাশোকরীও যেন না হয়

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু গুণাবলী থেকেই থাকে। কাউকে আল্লাহ পাক সুস্থতা দিয়েছেন, কাউকে সম্পদ দিয়েছেন, কাউকে মর্যাদা দিয়েছেন, কাউকে কোন পদ দিয়েছেন। এ সব বিষয় থাকার পরে মানুষ কিভাবে এগুলো কে অস্বীকার করবে? কিভাবেই বা সে বলবে যে, এটা আমার অর্জন হয়

নি! যদি সে এ (জাজ্বল্যমান) বাস্তবতা কে অস্বীকার করে তবে তো তা হবে নাশোকরী!

এজন্যই এ প্রশ্নের উত্তরে বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন যে, "বিনয়কে এত বেশি বাড়িয়োনা যে, তা নাশোকরীর পর্যায়ে চলে যায়, বরং বিনয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন নাশোকরী না হয়"।

এটা "বিনয়" নয়

হযরত থানভী রহ. নিজ মাওয়ায়েযে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : একদা আমি রেলে সফর করছিলাম। আমার নিকটে কিছু লোক বসা ছিল, তারা পরস্পরে কথাবার্তা বলছিল। এদিকে আমি ঘুমুতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু আল্লাহর ঐ বান্দারা কথাবার্তা বলেই চলছিল, যদ্দরুন আমার নিদ্রা আসছিল না। ফলে আমি আমার বার্থ থেকে উঠে নীচে এসে গেলাম। খাওয়ার সময় হলে তারা খানা বের করল এবং বলল যে, হযরত! তাশরীফ রাখুন এবং কিছু পেশাব-পায়খানা!! আপনিও খেয়ে নিন।

দেখুন! এই খানাকে তারা পেশাব পায়খানার শব্দে ব্যক্ত করেছে। আমি বললাম যে, ভাই! এটা তো খানা; তোমরা এটাকে পেশাব-পায়খানা বলছ কেন? জবাবে তারা বলল যে, বিনয়ের কারণে বলছি! যদি আমরা আমাদের খানাকে বড় করে দেখি তবে তা হবে অহংকার!! আমি বললাম যে, এ খানা হল মহান আল্লাহর নিয়ামত ও তাঁর রিযক; এত জঘন্য শব্দে এটাকে ব্যক্ত করা কিভাবে সহীহ হতে পারে?

এমনিভাবে যদি মহান আল্লাহ কাউকে কোন গুণ দান করেন তবে বুঝতে হবে যে, এটা আল্লাহরই দান, তাঁর দানের শুকরিয়া আদায় করতে হবে, নাশোকরী করা যাবে না।

অহংকার ও অকৃতজ্ঞতা থেকেও বাঁচতে হবে

একদিকে "নাশোকরী" বা অকৃতজ্ঞতা থেকেও বাঁচতে হবে, আরেকদিকে "তাকাব্বুর" বা অহংকার থেকেও বাঁচতে হবে। এবং

বিনয় অবলম্বন করতে হবে। উভয়টির মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ : যদি কেউ নামায আদায় করে বা রোযা রেখে মনে করে যে, আমি অনেক বড় আমল করে ফেলেছি! তাহলে এটা হবে অহংকার। আবার যদি নিজের আমলের ব্যাপারে বলে যে, এটা তো বেকার, অনর্থক; যেমনটি ইদানীং অনেকেই নামাযের ব্যাপারে বলে থাকে যে, আরে ভাই! "আমি তো কিছু ঠোকর মেরেছি মাত্র"! তাহলে সেটা হবে ঐ আমলের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নাশোকরী ও নাকদরী।

কৃতজ্ঞতা ও বিনয় কিভাবে জমা হবে?

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই উভয় ব্যাপার কে কিভাবে জমা করবে? অর্থাৎ নাশোকরীও হবে না, অহংকারও হবে না? কৃতজ্ঞতাও আদায় হবে আবার বিনয়ও আদায় করবে?

বাস্তবে এটা কোন মুশকিল কাজ নয়। বরং খুবই সহজ। সেটা এভাবে যে, মানুষ মনে করবে "আমার নিজের তো এ (নেক) আমল করার সামান্যতম শক্তি ও যোগ্যতাও ছিল না; কিন্তু মহান আল্লাহ নিজ বিশেষ অনুগ্রহ ও ফযলে এ আমল করিয়ে দিয়েছেন।

এভাবে উভয় বস্তুর মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। অর্থাৎ নিজেকে তুচ্ছ মনে করবে তো "বিনয়" হবে, আর মহান আল্লাহর দানের স্বীকৃতি প্রদান করবে তো "শোকর" আদায় হবে।

সুতরাং এভাবে বিনয় ও কৃতজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় সাধন হল।

দেখুন! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়টিকে একত্রিত করে দেখিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ

অর্থাৎ "আমি সমগ্র আদম সন্তানের সরদার" এর দ্বারা বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, নিজের অহংকার এর কথা বলা হচ্ছে। এ জন্য সাথে সাথে বলেছেন- "وَلَا فَخْرَ" অর্থাৎ আমি বড়ত্বের জন্য, অহমিকা স্বরূপ এ কথা বলছি না বরং আল্লাহ পাক নিজ দয়া ও অনুগ্রহে আমাকে বড়

বানিয়েছেন, এবং সমস্ত আদম সন্তানের সরদার বানিয়েছেন, এটা শুধুমাত্র আল্লাহর দান; আমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব এখানে নেই।

(তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৫৪৮)

একটি উদাহরণ

এ কথাটিকেই হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন, তিনি বলেন: এটাকে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝুন। পূর্বের যুগে ক্রীতদাসগণ নিজ মালিকের মালিকানায় থাকত, মালিক তাকে বাজারে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে বিক্রিও করতে পারত। মালিক যা নির্দেশ দিত ক্রীতদাস বা ভৃত্য কে তাই করতে হত। যদি মালিক সফরে যাওয়ার সময় বলত যে, "আমি এখন সফরে যাচ্ছি, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি রাজত্ব কর"। তখন সে ভৃত্য রাজত্ব করত, গভর্নরী করত, অথচ সে ভৃত্য বা ক্রীতদাসই থাকত।

এ জন্যই এ গোলামের মাথায় এ চিন্তা আসতেই পারে না যে, এ ক্ষমতা বা শক্তি যা আমার লাভ হয়েছে তা আমার যোগ্যতা বা শক্তির পুরস্কার, বরং সে গোলাম খুব ভাল ভাবেই জানে যে, প্রভু বা মালিক আসলে বলবেন যে, সর, এখন "বাইতুল খালা" (বাথরুম) পরিষ্কার কর। তখন ঐ সমস্ত সিংহাসন আর রাজত্ব পূর্বের অবস্থাতেই ফিরে চলে যাবে।

বুঝা গেল যে, সে গোলাম নিজেকে গোলাম ভেবেই রাজত্ব করছে। এ অনুভূতি তার আছে যে, আমি তো গোলামই।

বান্দার মরতবা গোলামের চেয়েও কম

এটা তো একজন গোলামের অবস্থা। কিন্তু "বান্দা" হওয়ার মরতবা এর চেয়েও অনেক নীচে। কাজেই যখন মহান আল্লাহ কাউকে কোন পদমর্যাদা দান করেন, তখন সে বান্দার বুঝা উচিত যে, এ মর্যাদা ও পদ তো আমাকে আল্লাহ পাক দান করেছেন। এ কারণেই আমি এ কাজ আঞ্জাম দিতে পারছি। নতুবা বাস্তবিক পক্ষে আমি তাঁর

বান্দা, আমার হাকীকত তো ঐ গোলামের চেয়েও নীচে, যাঁকে মালিক সিংহাসনে বসিয়ে অস্থায়ী ভাবে বাইরে গেছে। কত গোলাম (পৃথিবীর ইতিহাসে) অতীত হয়েছে যারা রাজত্ব করেছে; কিন্তু তারা অবশেষে গোলামই ছিল ।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একটি শিক্ষণীয় ঘটনার কথা মনে এসে গেল। জনৈক গোলাম নিজ মনিব ও মালিক এর সাথে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করে ফেলে। এবং নিজে বাদশাহী দখল করে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে বাদশাহ্ ছিল। শাহযাদাও জন্ম লাভ করে। কিন্তু বাস্তবে তো সে বাদশাহেরই গোলাম ছিল।

একদা সে গোলাম বাদশাহ্ তদানীন্তন বিখ্যাত বুযুর্গ শাইখ ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম রহ. যিনি সে যুগের মুজাদ্দিদ বা যুগ সংস্কারকও ছিলেন (ইন্তিকাল ৬৬০ হিজরী) তাঁকে ডেকে বাদশাহ বলেন : "আমি আপনাকে কাযী বানাতে চাই" প্রতিউত্তরে শাইখ বলেন যে, "আসলে কথা হল এই যে, কাযী বানানোর অধিকার শুধু ঐ ব্যক্তিরই আছে যিনি বরহক (ন্যায্যভাবে অধিষ্টিত) খলীফা, অথচ আপনি খলীফায়ে বরহক নন। কেননা আপনি তো গোলাম। আপনি নিজ মনিব কে হত্যা করে জবরদস্তির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছেন, নিজ অধীনে প্রচুর জায়গা জমি আপনি রেখেছেন, অথচ আপনি সেগুলোর মালিক হতে পারেন না, কেননা গোলামের মালিক হওয়ার যোগ্যতা নাই, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আপনার বর্তমান অবস্থার সংশোধন না করবেন, অতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার পক্ষ হতে প্রদত্ত কোন পদ গ্রহণ করব না"।

সে যুগে কিছুটা হলেও নসীহত কবূলের মন মানসিকতা ছিল, মহান আল্লাহর ভয় ছিল, অন্তরে বুযুর্গানে দ্বীনের কথার প্রতিক্রিয়া ছিল। ফলে সে গোলাম বাদশাহ্ শাইখ ইযযুদ্দীন রহ. কে বলেন যে, "হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন সবই সত্য। বাস্তবেই তো আমি গোলাম।

আপনি আমাকে এমন কোন উপায় বলে দিন যদ্দারা আমি এ গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি"।

জবাবে শাইখ বলেন ঃ "হ্যাঁ, এটার রাস্তা ও উপায় শুধু একটিই, আর তা হল আপনি ও আপনার ছেলেদেরকে বাজারে দাঁড় করিয়ে বিক্রি করা হবে, দাম ও মূল্য ঠিক করা হবে, নিলাম হবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ আপনার মরহুম মনিবের আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে, আর যে আপনাদের কে ক্রয় করবে সেই আযাদ করে দিবে, এভাবে আপনার আযাদী লাভ হবে"।

দেখুন! বাদশাহ্‌কে কী সব কথা বলা হল যে, "আপনাকে বিক্রি করা হবে", "মূল্য নির্ধারণ করা হবে", "নিলাম করা হবে" ইত্যাদি!!

তবে যেহেতু সে বাদশাহের দিলে কিছুটা হলেও আল্লাহভীতি, উলামাপ্রীতি ও আখিরাতের চিন্তা ছিল, সে জন্য তিনি এ কথা ও প্রস্তাবে সম্মত হন।

তাই তো দেখা যায় যে, ইতিহাসের এটাই একমাত্র ঘটনা, যেখানে বাদশাহ্ ও শাহযাদাদের বাজারে দাঁড় করিয়ে নিলাম করা হয়েছে!!

যাই হোক, এরপর জনৈক ব্যক্তি সে বাদশাহ্ কে ক্রয় করেন। অতঃপর তাঁর থেকে মুক্তিপণ বা বিনিময় আদায় করে তাঁকে আযাদ ও মুক্ত করে দেন। এরপরই এ বাদশাহের বাদশাহী শুদ্ধ হয়।

আমাদের মুসলিম জাতির ইতিহাসে এমন সব অনবদ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ইতিহাসে দেখা যাবে না।

তো আমি বলছিলাম যে, যেভাবে একজন গোলাম সিংহাসনে আসীন থাকা সত্বেও বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, আমি গোলাম, ঠিক তেমনিভাবে যখন আমাদেরকেও কোন দায়িত্বে সমাসীন করা হবে, তখন বুঝতে হবে এবং দিলে এ কথা হাযির রাখতে হবে যে, আমি তো মহান আল্লাহরই বান্দা মাত্র।

এ বাস্তবতা মনে বদ্ধমূল থাকলে কখনো পদে বসে অন্যের উপর যুলুম ও অত্যাচার করা সম্ভব নয়।

ইবাদতে বিনয় অবলম্বন

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা নামায আদায় করার তাউফীক দান করলে এমনটি করা উচিৎ নয় যে, এ নামায আদায়ের কথা অন্যান্যদের সামনে বলে বেড়াব যে, আমি নামায পড়েছি! নামায পড়ে অনেক বড় বুযুর্গ হয়ে গেছি!!

যেমনটি আরবী ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ কথা রয়েছে

صَلَّى الْحَائِكُ رَكْعَتَيْنِ وَانْتَظَرَ الْوَحْيَ

অর্থাৎ, জনৈক তাঁতির একদা দু'রাকাত নফল নামায পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, সে এ দু'রাকাত আদায় করে ওহী নাযিল হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল!

সে এটা মনে করল যে, আমি যে আমল করেছি এটা এতই বড় আমল যে, এটার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর ওহী আসা উচিৎ!!

অতএব নিজের আমল কে খুব বেশি বড় করে দেখাও উচিৎ নয়, আবার নিজের আমলকে এত তুচ্ছ ভাবাও উচিৎ নয় যাতে নাশোকরী হয়ে যায়।

যেমনটি অনেকে বলে থাকে যে, আমার আবার নামায? আমি তো শুধু উঠা বসা করি! মুরগীর ন্যায় ঠোকর মারি!!

এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ নয়। এতে নামাযের অসম্মান করা হয়। বরং এভাবে বলা চাই যে, আমি তো নিজের থেকে কিছুই করতে পারতাম না, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাউফীক দান না করতেন।

দুটি কাজ করুন

এ জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যখনই কোন ইবাদতের তাউফীক হবে, তখনই দু'টি কাজ করা চাই। প্রথমতঃ শোকর আদায় করা উচিৎ যে, মহান আল্লাহ আমাকে এ কাজ করার তাউফীক দান

করেছেন, নতুবা কত মানুষ আছে যাদের এ আমলের তাউফীক হয়নি। মহান আল্লাহর খাস মেহেরবানী যে, তিনি আমাকে তাউফীক দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ "ইস্তিগফার" বা আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাওয়া। যেন এ কাজে যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে, মহান আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দেন।

ইনশাআল্লাহ এ দু'টি কাজের বরকতে মহান আল্লাহ সে আমলটিকে কবূল করবেন।

বিশেষ অবস্থা কখনো কাম্য নয়

আমাদের অন্তরে সর্বদা এ প্রশ্ন থাকে যে, এতদিন ধরে নামায পড়ছি, তাসবীহ পাঠ করছি, যিকর করছি, বিভিন্ন নেক আমলের অভ্যাসও আছে, তাহাজ্জুদ-ইশরাকও আদায় করি, কিন্তু এত কিছুর পরও দিলের অবস্থায় কেন পরিবর্তন আসে না? বিশেষ অবস্থা কেন সৃষ্টি হচ্ছে না?

খুব বুঝে নিন! এ বিশেষ অবস্থা কখনো মাকসূদ বা উদ্দেশ্য নয়। আর যা কিছু আমলের তাউফীক হচ্ছে তা মহান আল্লাহর বিশেষ পুরস্কার ও অনুগ্রহ। আর এই যে, একটি চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে যে, জানি না আমার এ আমলগুলো মাকবূল হয়েছে কিনা? এ ভয় অবশ্যই দিলে থাকা চাই। আর সর্বদা এ চিন্তা করবে যে, বাস্তবিক পক্ষে তো এ আমলগুলো এরকম নয় যা মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করা যায়, কিন্তু যখন তিনি আমলের তাউফীক দিয়েছেন তখন তাঁর রহমতে এটাই আশা করা যায় যে, এ আমল তিনি কবূল করে নিবেন।

ইবাদত কবূল হওয়ার একটি আলামত

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. মহান আল্লাহ তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন। (আমীন) তাঁকে কেউ প্রশ্ন করে যে, হযরত! এত দিন থেকে নামায পড়ছি, জানি না মহান আল্লাহর দরবারে কবূল হচ্ছে কিনা? প্রতিউত্তরে হযরত বলেন ঃ আরে ভাই! যদি এ নামায কবূল না হত, তাহলে দ্বিতীয় বার পড়ার তাউফীক হত না। যখন তুমি

একটি আমল একবার করার পর মহান আল্লাহ ঐ আমলই পুনরায় করার তাউফীক দান করেছেন, তখন এটা একথারই আলামত যে, প্রথম আমলটি কবূল হয়েছে ইনশাআল্লাহ। এটা এ কারণে নয় যে, ঐ আমলের কোন বিশেষত্ব ছিল, বরং শুধু এ কারণে যে, মহান আল্লাহ তাউফীক দিয়েছেন।

এ জন্য নিজ নামায ও ইবাদতকে কখনো তুচ্ছ ভাববে না।

জনৈক বুযুর্গের ঘটনা

মাওলানা রূমী রহ. তাঁর "মছনবী" তে জনৈক বুযুর্গের ঘটনা লিখেছেন যে, এক বুযুর্গ বহুদিন পর্যন্ত নামায, রোযা, তাসবীহ, যিকর ইত্যাদিতে মশগুল ছিলেন। একদিন তাঁর মনে এ চিন্তা আসে যে, আমি এতদিন থেকে এ সব ইবাদত করছি, অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে তো কোন উত্তর আসছে না। জানি না আল্লাহর নিকট এ আমল পসন্দনীয় কিনা?

পরিশেষে তিনি তাঁর শায়েখের নিকট আরয করেন যে, হযরত!। এতদিন থেকে আমল করছি, তবুও তো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন উত্তর আসছে না!! এ কথা শ্রবণ করে শায়েখ বলেন যে, "আরে বেকুব! এই যে আল্লাহ পাক তোমাকে আমল করার তাউফীক দিচ্ছেন; এটাই তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিউত্তর। কেননা যদি তোমার আমল কবূল না হত; তাহলে তোমার "আল্লাহ" "আল্লাহ" করার তাউফীক নসীব হত না। অন্য কোন উত্তরের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই

کہ گفت آں اللہ لبیک ماست

زیں نیاز و درد و سوزک ماست

অর্থাৎ, এই যে তুমি আল্লাহ আল্লাহ করছ, এটাই আমার পক্ষ থেকে "লাব্বাইকা" বলা। এটা তোমার ঐ আল্লাহ আল্লাহ বলারই প্রতিউত্তর, যে একবার বলার পর তিনি দ্বিতীয়বার তোমাকে বলার তাউফীক দান করেছেন।

একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলতেন, "একদিন কোন মানুষের নিকট গিয়ে তার প্রশংসা কর, এবং তার ব্যাপারে ভাল ভাল কথা বল, এরপরে দ্বিতীয় দিন, অতঃপর তৃতীয় দিনেও এমনটি কর। এখন তোমার এ কাজ ও কথা যদি তার পসন্দ হয় তবে তো সে অবশ্যই তোমার কথা শুনবে, বাঁধা দিবে না। কিন্তু যদি তোমার এ আমল তার কাছে পসন্দনীয় না হয় তাহলে দ্বিতীয়বার তো বাঁধা দিবে না ঠিকই, কিন্তু তৃতীয়বারে তোমাকে বের করে দিবে, তোমাকে প্রশংসা করতে দিবে না।

ঠিক এমনিভাবে যখন মহান আল্লাহর ইবাদত ও যিকরের পর আল্লাহ পাক তা জারী রাখার তাউফীক দিয়েছেন, তখন এটাই আলামত যে, তোমার এ আমল আল্লাহ পাকের পসন্দ হয়েছে। ইনশাআল্লাহ। কাজেই এটাকে অবজ্ঞা করা উচিৎ নয়, বরং এর উপর আল্লাহ পাকের শোকর ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত"।

সমস্ত কথার সারকথা

আমাদের হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই রহ. বলতেন যে, সহজ সরল কথা এটাই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মুতাবিক আমল করতে থাক। এবং প্রতিটি আমলের উপর মহান আল্লাহর শোকর আদায় কর যে, হে আল্লাহ! আপনি আপনার মেহেরবানী ও অনুগ্রহে তাউফীক দান করেছেন, আপনার শুকরিয়া; নতুবা আমার মধ্যে তো কোন শক্তিই ছিল না।

আর যখন আপন ভুল ও ত্রুটির খেয়াল আসবে, তখন সেটার জন্য এভাবে তাওবা ও ইস্তিগফার করবে যে, "হে আল্লাহ! আমার দ্বারা ভুল ও অন্যায় হয়েছে, আমাকে মাফ করে দিন"। এমনটি করলে ইনশাআল্লাহ বিনয়ের হকও আদায় হবে, শোকরের হকও আদায় হবে। আর অহংকারও কাছে আসতে পারবে না।

বিনয় অর্জনের পদ্ধতি

বিনয় অর্জন করার পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, নিজেকে মনে করতে হবে, আমি তো মহান আল্লাহর একজন নগন্য বান্দা মাত্র, তিনি আমার যিম্মায় যে কাজ দিবেন, সে কাজ আমি করব। যদি তিনি কোন পদে সমাসীন করেন, তাহলে সে দায়িত্ব আঞ্জাম দিব; যেহেতু আমি তাঁর বান্দা ও গোলাম, কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে যা কিছু দান করেছেন এটা একমাত্র তাঁরই দয়া ও মেহেরবানী। এভাবে বললে শোকর ও বিনয় উভয়টিই পাওয়া যায়।

এ জন্যই সূফিয়ায়েকিরাম বলে থাকেন যে, "আরেফীন" বা আল্লাহ পাকের মারেফতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বিপরীতমুখী জিনিসের সমন্বয়কারী হয়ে থাকেন। অর্থাৎ বাহ্যদৃষ্টিতে যে জিনিসগুলো একটি অপরটির বিপরীত মনে হয় তাঁদের মধ্যে সেগুলোর সম্মেলন পাওয়া যায়।

উদাহরণ স্বরূপ: একদিকে তাঁরা নিজেদের আমল কে তুচ্ছও বলেন না, এবং অপরদিকে সে আমলের উপর আহলাদিত হন না, বরং ভাবেন যে, আমার তুলনায় এ আমল তো কিছুই নয়, কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে এ আমলই কত বড়। এটা মহান আল্লাহরই তাউফীক ও পুরস্কার। এভাবে উভয়টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়।

বেশি করে শোকর আদায় কর

আমাদের হযরত রহ. বারবার বলতেন ঃ "আমি তোমাদের কে একটি কথা বলছি, আজ হয়ত তোমরা সে কথাটির কদর করবে না; কিন্তু যখন মহান আল্লাহ তোমাদেরকে বুঝার তাউফীক দান করবেন, তখন তোমাদের সে কথাটির কদর হবে। আর সে কথাটি হল আল্লাহ তা'আলার শোকর বেশি করে কর। কেননা যত বেশি শোকর আদায় করবে, তত বেশি বাতেনী ও অভ্যন্তরীণ ব্যাধিগুলোর গোড়া কেটে যাবে"।

আসল কথা হল, সে সময় তো হযরত রহ. এর এ কথাগুলো এত বুঝে আসত না। এখন অবশ্য কিছু কিছু বুঝে আসছে যে, এ শোকর

এমনই এক দৌলত ও সম্পদ যা দিলের অসংখ্য রোগকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে।

হযরত আরো বলতেন ঃ "মিঞা! ঐ সব (পূর্বের যুগের বুযুর্গদের ন্যায়) রিয়াযত ও মুজাহাদা আর কতটুকু করতে পারবে? যা পূর্বের যমানার লোকগণ নিজ নিজ শায়েখের নিকট গিয়ে করত। গড়াগড়ি খেত, ভীষণ মেহনত করত, প্রচুর কষ্ট সহ্য করত, ক্ষুধার্ত থাকত।

কিন্তু তোমাদের নিকট এখন এত সময় কোথায়? আর এত সুযোগই বা কৈ? কাজেই একটি কাজ কর ? সেটা হল বেশি করে শোকর আদায় কর, যত বেশি শোকর আদায় করবে অত বেশি বিনয় পয়দা হবে। আর সেই সঙ্গে মহান আল্লাহর রহমতে অহংকার দূর হবে, বাতেনী রোগ উৎপাটিত হবে"।

"শোকর" এর অর্থ

আর "শোকর" আদায়ের সময় একটু চিন্তা ভাবনা করে "শোকর" আদায় করবে যে, "শোকর" এর অর্থ কি? "শোকর" এর অর্থ এই যে, আমি তো ঐ জিনিসের উপযুক্ত ছিলাম না; বরং মহান আল্লাহ নিজ অপার অনুগ্রহে তা আমাকে দান করেছেন, এটার নাম "বিনয়"। যদি নিজেকে উপযুক্তই মনে করা হয়, তাহলে বিনয় থাকল কি? শোকর হল কি?

যদি কোন মানুষ কোন বস্তু পাওয়ার উপযুক্ত হয়, আর তাকে ঐ বস্তু দেয়া হয়; তাহলে সেটা শোকরের কোন ক্ষেত্র নয়। মনে করুন! কেউ অপর জন থেকে করয বা ঋণ নিল, এখন এ করয গ্রহণকারী ব্যক্তির দায়িত্ব ও অবশ্য কর্তব্য হল সে ঐ করয প্রদানকারী ব্যক্তিকে করয শোধ করবে, কেননা করয প্রদানকারী ঐ অর্থের উপযুক্ত। অতঃপর, যখন এ করয গ্রহণকারী ঐ অর্থ করয প্রদানকারীকে ফেরত দিবে, তখন ঐ করয প্রদানকারীর জন্য শোকর আদায় করা ওয়াজিব বা জরুরী নয়। কেননা, এ অর্থ পরিশোধ করে তার উপর বিশেষ

কোনো ইহসান বা অনুগ্রহ করা হয়নি। "শোকর" তো ঐ সময় হবে, যখন মানুষ মনে করবে যে আমি তো ঐ জিনিসের উপযুক্ত ছিলাম না, কিন্তু আমাকে আমার উপযুক্ততার উর্ধ্বে ঐ বস্তু দেয়া হয়েছে।

কাজেই যে কোন নিয়ামত এর উপর "শোকর" আদায়ের পূর্বে একটু চিন্তা করবে যে, আমি এ নিয়ামতের উপযুক্ত ছিলাম না, কিন্তু মহান আল্লাহ নিজ অপার ফযল ও করমে আমাকে তা দান করেছেন। ব্যস, এভাবে চিন্তা ভাবনা করলে ইনশাআল্লাহ বিনয় অর্জিত হবে।

উদাহরণস্বরূপ কোন পদমর্যাদা লাভ হলে চিন্তা করবে যে, হে আল্লাহ! এটা তো নিছক আপনার মেহেরবানী ও দয়া, আপনি আমাকে দান করেছেন, নতুবা আমার তো এটার সামান্য শক্তি ছিল না, যোগ্যতাও ছিল না।

এভাবে চিন্তা করবে, তো ইনশাআল্লাহ বিনয় হাসেল হবে। আর যখন "বিনয়" হাসেল হবে, তখন তার উপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অঙ্গীকার তো আছেই।

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ পাক তাঁকে বুলন্দী ও উচ্চতা দান করেন।

(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫২)

শেষ কথা

একটি কথা আরো বুঝুন! আর তা হল "বিনয়" যদিও অন্তরের আমল, অর্থাৎ মানুষ নিজেকে অন্তরে অন্তরে "বে হাকীকত" বা তুচ্ছ মনে করবে, কিন্তু দিলের মধ্যে এটা হাযির রাখার জন্য মানুষ এ কাজটিও করবে যে, কোন কাজের থেকেই নিজেকে উর্ধ্ব মনে করবে না, আর কোন নেক কাজ করতে সংকোচবোধ করবে না, তা যত সাধারণ কাজই হোক না কেন। এটা মনে করবে না যে, এ কাজ আমার পদমর্যাদার তুলনায় নীচের, বরং প্রত্যেক ছোট থেকে ছোট কাজের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হল, মানুষ তার প্রত্যেক উঠা বসায়, চাল চলনে, এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে যাতে অহংকার না থাকে, বরং বিনয় ও নম্রতা থাকে। যদিও বিনয় এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু সেটাও বিনয় অর্জন করার একটি পদ্ধতি।

যার সার কথা হচ্ছে এই যে, জাহেরী বা বাহ্যিক কার্যকলাপেও মানুষ অনুনয় ও নম্রতা অবলম্বন করবে। এ জন্যই যে, এমনটি করার ফলে ইনশাআল্লাহ বাতেন বা অন্তরেও বিনয় সৃষ্টি হবে।

মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের সকলের মধ্যে "বিনয়" সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

توبہ: گناہوں کا تریاق

তাওবা : গুনাহসমূহের প্রতিষেধক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ـ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـــ صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শতবার ইসতিগফার পাঠ করা

وَعَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّهٗ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِيْ حَتّٰى اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِأَةَ مَرَّةٍ.

হযরত আগার মুযানী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন : “কখনো কখনো আমার অন্তরও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাইতো আমি আল্লাহ পাকের কাছে দৈনিক একশত বার ইসতিগফার করি”। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর হাদীস নং ২৭০২)

এ কথা কে বলেছেন? ঐ সত্তা যাঁকে আল্লাহ তাআলা সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ বানিয়েছেন। তাঁর থেকে কোন গুনাহ হওয়ার তো কল্পনাই করা যায় না। আর যদি তাঁর থেকে কোন ভুল ত্রুটি হয়েও থাকে, তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেয়াই আছে–

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

"যাতে করে আল্লাহ তাআলা আপনার আগে-পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।" (সূরাতুল ফাতহ: ২)

এতদসত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি দৈনিক একশত বার ইসতিগফার করি।" এ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেন : এ হাদীসে "একশত" সংখ্যা দ্বারা গণনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। বরং ইসতিগফার এর আধিক্যের প্রতি ইশারা করা উদ্দেশ্য।

গুনাহের কুমন্ত্রণা সকলের মনেই আসে

অতঃপর এ হাদীসে ইসতিগফারের কারণও বয়ান করে দিয়েছেন যে, আমি এত বেশি ইসতিগফার এ জন্য করি, কারণ কখনো কখনো আমার অন্তর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়। উদ্দেশ্য হল কখনো কখনো মানবীয় প্রকৃতির তাকাযায় একজন নবীর অন্তরেও খেয়াল ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হতে পারে।

কোন একজন মানুষ নেকী ও তাকওয়ার যত উচ্চ মাকামেই অধিষ্টিত হোক না কেন, কিন্তু গুনাহের ঝলক থেকে বাঁচতে পারে না।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাকাম তো অনেক ঊর্ধ্বে। ঐ মাকাম পর্যন্ত কেউ পৌঁছতেই পারে না। কিন্তু যত আউলিয়ায়ে কিরাম, সূফীয়ায়ে ইযাম এবং বুযুর্গানে দ্বীন গত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ এমন নেই, যার অন্তরে কখনো গুনাহের খেয়াল বা কুমন্ত্রণাই আসেনি। আর প্রবৃত্তির কোন চাহিদাই সৃষ্টি হয়নি। অতএব গুনাহের ঝলক তো বড়দেরও আসে। কিন্তু পার্থক্য হল এই যে,

আমাদের মত উদাসীন মানুষেরা গুনাহের সামান্য আবেদনেই হাতিয়ার সমর্পণ করে ফেলি আর গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাই, কিন্তু যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা তাউফীক দান করেন তাঁদের অন্তরে গুনাহের খেয়াল ও কুমন্ত্রণা আসা সত্ত্বেও আল্লাহর ফযলে এবং মুজাহাদার বরকতে ঐ সব খেয়াল, কুমন্ত্রণা ও ইচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়ে। অতঃপর ঐ ইচ্ছা মানুষের উপর প্রবল হতে পারে না। ফলশ্রুতিতে গুনাহের খেয়াল আসা সত্ত্বেও ঐ খেয়ালের উপর আমল হয় না।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ

অর্থাৎ, "সেই রমণী তো তার (হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম) প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত"। (সূরা ইউসুফ : ২৪)

সারকথা হল, যুলাইখা যখন গুনাহের প্রতি আহ্বান করল, তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অন্তরেও গুনাহের সামান্য খেয়াল এসে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ গুনাহ থেকে হেফাযত করেছেন।

এই ভাবনা ভুল

অতএব তাসাওউফ ও তরীকতের ব্যাপারে এমনটি মনে করা ঠিক নয় যে, এখানে কদম রাখার পর বদঅভ্যাস ও গুনাহসমূহ পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যাবে। আর গুনাহের খেয়ালই অন্তরে আসবে না। বরং যেটা হয়ে থাকে সেটা হল, মুজাহাদা ও মেহনতের ফলে গুনাহের তাকাযা বা চাহিদা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সেটার মুকাবিলা সহজ হয়ে যায়। এটাই এ পথের বড় সাফল্য। কিন্তু এটা চিন্তা করা যে, মুজাহাদা করার পর অন্তরে গুনাহের খেয়ালই আসবে না, এটা অসম্ভব। এটা কখনোই হতে পারে না।

যৌবনকালে তাওবা করুন

কেননা আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে গুনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝٨

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে গুনাহের চাহিদাও সৃষ্টি করেছেন এবং তাকওয়ার চাহিদাও সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আশশামস : ৮)

এর মধ্যেই তো পরীক্ষা। কেননা যদি মানুষের অন্তর থেকে গুনাহের চাহিদা একেবারে শেষ হয়ে যায়, তাহলে গুনাহ থেকে বাঁচার স্বার্থকতা কী? তাহলে তো নফস আর শয়তান কারো সাথেই মুকাবিলা থাকল না, তাহলে কিসের বিনিময়ে জান্নাত লাভ হবে?

কেননা জান্নাত তো এটারই পুরস্কার যে, অন্তরে গুনাহের চাহিদা ও আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু মানুষ সেটাকে পরাস্ত করে মহান আল্লাহর ভয় ও বড়ত্বের কারণে ঐ সব চাহিদার উপর আমল করে না। তখনই মানুষের মুন্সীয়ানা ফুটে উঠে।

কবি শেখ সাদী রহ. বলেন :

وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیز گار
در جوانی توبہ کردن شیوهٔ پیغمبری

অর্থাৎ, বুড়োকালে অত্যাচারী বাঘও মুত্তাকী পরহেযগার হয়ে যায়। কেননা এখন না আছে মুখে দাঁত আর না আছে পেটে আঁত। এখন তো অত্যাচার করার শক্তিই নেই। কাজেই এখন পরহেযগার হবে না তো কী হবে? কিন্তু পয়গম্বরদের আদর্শ হল, যুবক বয়সেই তাওবা করা। যখন তার মধ্যে শক্তি বিদ্যমান আর গুনাহের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে, গুনাহের ক্ষেত্রসমূহ সহজলভ্য। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষ আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে যাক। এটাই হল পয়গম্বরী আদর্শ।

বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্যের প্রভাব

অনেকে এটা চিন্তা করে যে, কোন আল্লাহওয়ালা আমার উপর বিশেষ নজর দিবেন, বুকের সাথে লাগাবেন আর তাঁর বুকে থাকা নূরসমূহ আমার বুকে স্থানান্তর করে দিবেন, যদ্দরূন গুনাহের চাহিদাই অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে!

মনে রাখবেন, এমনটি কখনো হবে না। এমন চিন্তা চেতনা যিনি লালন করেন তিনি ভুলের মধ্যে আছেন। এমনটি হলে তো দুনিয়াতে কোন কাফেরই থাকত না। কেননা তখন বিশেষ নজরের দ্বারা সবাই মুসলমান হয়ে যেত।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর খেদমতে একবার জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হল এবং বলল যে, হযরত! আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত নসীহত করে দিলেন। পরে ঐ আগন্তুক বিদায় নেয়ার সময় বলতে লাগল "হযরত! আমাকে আপনার সীনা থেকে কিছু দান করুন। তার উদ্দেশ্য ছিল, হযরতের সীনা থেকে কোন নূর বের হয়ে আমার সীনার মধ্যে প্রবেশ করবে, ফলশ্রুতিতে আমি বেড়া পার হয়ে যাব, আর আমার গুনাহের চাহিদা খতম হয়ে যাবে"।

হযরত উত্তরে বললেন : আমি সীনা থেকে কী দিব? আমার সীনায় তো কফ আছে,মনে চাইলে নিয়ে যাও!

যাইহোক, এই যে ধারণা, কোন বুযুর্গের বিশেষ দৃষ্টি পড়বে অথবা সীনা থেকে কিছু পাওয়া যাবে, যদ্দরূন সমস্ত খারাপ স্বভাব দূর হয়ে যাবে। এটা ভুল ধারণা।

ایں خیال است و محال است و جنون

এটা শুধু খেয়াল মাত্র। এটা অসম্ভব ও পাগলামী ভিন্ন আর কিছু নয়।

অবশ্য আল্লাহ তাআলা বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্যে বিশেষ ক্রিয়া অবশ্যই রেখেছেন। এর মাধ্যমে মানুষের চিন্তা ভাবনার গতিপথ বদলে যায়। মানুষ সঠিক পথে চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু কাজ নিজেকেই করতে হবে।

সব সময় নফসের নেগরানী জরুরী

যাইহোক, গুনাহের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা একেবারেই শেষ হবে না। চাই যত বড় মাকামেই পৌঁছুক না কেন। অবশ্য দুর্বল অবশ্যই হবে। এ কারণেই যদি কোন ব্যক্তি বছরের পর বছর কোন বুযুর্গের সান্নিধ্যে থাকে আর যে জিনিস বুযুর্গানে দ্বীনের সান্নিধ্যে থেকে অর্জন করা হয় সেটা হাসিল হয়েও যায়, অন্তরে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর সাথে সম্পর্কও হাসিল হয়ে যায় তবুও মানুষকে প্রতি পদক্ষেপে স্বীয় নেগরানী করতে হয়। এমন নয় যে, এখন শাইখ বনে গেছে। শাইখের থেকে ইজাযত হাসিল হয়ে গেছে, ফলে নিজের থেকে গাফেল হয়ে গেল! আর এ চিন্তা করল যে, এখন তো আমি মনযিলে মাকসূদে পৌঁছে গেছি আমি ঐ মাকামে পৌঁছে গেছি যেখানে নফস ও শয়তানও আমার কিছুই করতে পারবে না।

এই ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা শাইখের সাহচর্যের বরকতে এতটুকু অবশ্যই হয়েছে যে, গুনাহের চাহিদা দুর্বল হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও সব সময় নফসের নেগরানী করতে হয়। কেননা যে কোন মুহূর্তে এ চাহিদা দ্বিতীয়বার যিন্দা হয়ে মানুষকে পেরেশান করতে পারে।

এজন্যই কবি বলেছেন :

اندریں رہ می تراش وی خراش
تادم آخر دمے فارغ مباش

কাব্যানুবাদ :

মুজাহাদা আর মেহনতেরই তরবারীতে,
কাটতে থাক, ফাড়তে থাক অন্তরটাকে।

অর্থাৎ সুলূক বা আল্লাহপ্রাপ্তির পথে নিজ দিলকে সব সময় কাটতে হয় আর ফাড়তে হয়। এমনকি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত গাফেল হওয়া যাবে না। কেননা এই নফস যে কোন মুহূর্তে মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে।

জনৈক কাঠুরিয়ার ঘটনা

মাওলানা রূমী রহ. মছনবীতে একটি ঘটনা লিখেছেন। জনৈক কাঠুরিয়া ছিল। যে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে আনত। আর সেটা বাজারে বিক্রি করত। একবার যখন কাঠ কেটে আনল, তখন কাঠের সাথে একটা বড় সাপও লেপ্টে চলে আসল। সে খেয়াল করেনি। কিন্তু যখন ঘরে পৌঁছল তখন দেখল যে, একটি সাপও এসে গেছে। অবশ্য সেটার মধ্যে স্পন্দন ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন সেটা মৃত। এজন্য ঐ কাঠুরিয়া এ দিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। ওভাবেই ঘরের মধ্যে থাকতে দিয়েছে। বাইরে বের করার প্রয়োজন অনুভব করেনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর উষ্ণতা অনুভব করায় সাপের মধ্যে নড়াচড়া আরম্ভ হল। ধীরে ধীরে সে আড়মোড় ভাঙ্গা আরম্ভ করল। কাঠুরিয়া গভীর নিদ্রায় উদাসীন ছিল। ঐ সাপ গিয়ে তাকে দংশন করল। এখন ঘরের মানুষেরা পেরেশান যে, এ তো মৃত সাপ ছিল। কিভাবে জীবিত হয়ে সে দংশন করল?

নফসও একটি অজগর

এই ঘটনা নকল করার পর মাওলানা রূমী রহ. বলেন : মানুষের নফসেরও একই অবস্থা। যখন মানুষ কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে মুজাহাদা ও রিয়াযত করে, তখন এর ফলে নফস দুর্বল হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন সে মরে গেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে মৃত নয়। যদি মানুষ তার থেকে উদাসীন হয়ে যায়, তাহলে যে কোন সময় জীবিত হয়ে দংশন করবে। তাইতো মাওলানা রূমী রহ. বলেছেন :

نفس اژدہا است مردہ است
از غمِ بے آلتی افسردہ است

অর্থাৎ মানুষের নফসও অজগরের মত মরেনি কিন্তু যেহেতু রিয়াযত ও মুজাহাদার চোট তার উপর পড়েছে। এজন্য সে মরার মত পড়ে আছে। যে কোন সময় জীবিত হয়ে দংশন করবে। এজন্য কোন একটা মুহূর্তও নফস থেকে উদাসীন হয়ে বসে থেকো না।

সমস্ত গুনাহের প্রতিষেধক হল “ইসতিগফার” এবং “তাওবা”

যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা “নফস” এবং “শয়তান” নামক দুটি বিষাক্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষকে পেরেশান ও নষ্ট করে এবং মানুষকে জাহান্নামের আযাবের দিকে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে এ দুটি বস্তুর প্রতিষেধকও বানিয়েছেন দারুণ সুন্দর দুটি জিনিস।

মহান আল্লাহর হেকমত থেকে এটা অনেক দূরের ব্যাপার ছিল যে, তিনি বিষ তো সৃষ্টি করবেন অথচ সেটার প্রতিষেধক সৃষ্টি করবেন না। আর সেই প্রতিষেধকও এমন শক্তিশালী বানিয়েছেন যে, তাৎক্ষণিকভাবে ঐ বিষের ক্রিয়া ধ্বংস করে ফেলে। সেই প্রতিষেধকদ্বয় হল “ইসতগিফার” ও “তাওবা”।

অতএব যখনই নফস নামক এই সাপ তোমাকে দংশন করবে অথবা দংশনের আশংকা দেখা দিবে, তখন তোমরা সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষেধক ব্যবহার করতঃ বলবে :

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ إِلَيْهِ

অর্থাৎ “আমি আমার প্রভুর নিকট সমস্ত গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছেই আমি তাওবা করছি।”

এই প্রতিষেধক ঐ বিষের সমস্ত ক্রিয়া খতম করে দিবে।

যাইহোক, আল্লাহ তাআলা যে ব্যাধি বা বিষ সৃষ্টি করেছেন সেটার প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন।

কুদরতের অদ্ভূত কারিশমা

একবার আমি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন এলাকায় রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করছিলাম। রাস্তায় এক পাহাড়ী স্থানে গাড়ী থেমে গেল। আমরা নামাযের জন্য নিচে নামলাম। সেখানে আমি দেখলাম খুব সুন্দর একটি চারা। তার পাতাও খুব সুন্দর ছিল।

মনের অজান্তেই ইচ্ছা হল পাতাটা একটু ছিঁড়ে দেখি। আমি পাতা ছিঁড়ার জন্য হাত বাড়াতেই আমার রাহবার (পথনির্দেশক) জোরে চিৎকার করে বলে উঠলেন : হযরত! এটাতে হাত লাগাবেন না। আমি বললাম : কেন? তিনি বললেন : এটা অত্যন্ত বিষাক্ত পাতা। এটা দেখতে খুব সুন্দর হলেও এটা এমনই বিষাক্ত যে, এটা স্পর্শ করলে মানুষের শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। যেমন বিচ্ছু দংশন করলে মানুষের শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে।

আমি বললাম : আল্লাহ তাআলার শোকর যে, আমি হাত লাগাইনি। আর আগেই জানতে পারলাম। এটা তো ভয়ংকর এক জিনিস! দেখতে খুব সুন্দর।

অতঃপর আমি তাকে বললাম যে, ব্যাপারটা তো ভীষণ ভয়ংকর। কেননা আপনি বলার কারণে আমি বেঁচে গেছি। কিন্তু যদি কেউ না জেনে তাতে হাত লাগায়, তাহলে তো সে ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে।

এই প্রেক্ষিতে আমার ঐ পথনির্দেশক এর থেকেও অদ্ভূত কথা বললেন। সেটা হচ্ছে এই যে, এটা আল্লাহ তাআলার কুদরতের অত্যাশ্চর্য কারিশমা যে, যেখানেই এই বিষাক্ত ঝোপঝাড় হয় সেখানেই এর আশেপাশেই আরেকটা চারা পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ বিষাক্ত চারায় কারো হাত লেগে গেলে তার কর্তব্য হল সঙ্গে সঙ্গে ঐ দ্বিতীয় চারায় হাত লাগাবে। তাহলে সাথে সাথেই সেটার বিষ শেষ হয়ে যাবে। ফলে তিনি আমাকে ঐ দ্বিতীয় চারাটিও দেখালেন যা সেই বিষাক্ত চারার প্রতিষেধক।

ব্যস, এটাই আমাদের গুনাহ এবং তাওবা-ইসতিগফারের দৃষ্টান্ত। অতএব যেখানেই গুনাহের বিষ পাওয়া যাবে, সেখানেই তাৎক্ষণিকভাবে তাওবা-ইসতিগফারের প্রতিষেধক ব্যবহার করুন। ঐ সময়েই ঐ গুনাহের বিষ নেমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

খলীফাতুল আরয তথা জমিনের প্রতিনিধিকে প্রতিষেধক দিয়ে পাঠিয়েছেন

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. একবার বললেন : আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে গুনাহের যোগ্যতা রেখেছেন। অতঃপর তাকে খলীফা বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর যে মাখলূকের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতা নেই, তাদেরকে নিজের খলীফা বানাননি। অর্থাৎ ফেরেশতা, যাঁদের গুনাহের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই, তো তাঁরা খিলাফতের যোগ্যও নন। আর মানুষের মধ্যে গুনাহ করার মত যোগ্যতাও রেখেছেন। আবার দুনিয়াতে পাঠানোর পূর্বে নমূনা এবং প্রশিক্ষণ হিসেবে একটি ভুলও করিয়েছেন। তাইতো যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতে পাঠানো হয়েছে, তখন বলে দেয়া হয়েছে, পুরো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বেড়াতে পার, যা মনে চায় খেতে পার কিন্তু ঐ গাছের ফল খাবে না।

এরপর শয়তান জান্নাতে পৌঁছে গেল। এবং সে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে বিভ্রান্ত করল। যদ্দরূন তিনি ঐ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন এবং ভুল প্রকাশ হয়ে গেল। এই ভুল তাঁর মাধ্যমে করানো হয়েছে। কেননা কোন কাজ মহান আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে হয় না। কিন্তু ভুল করার পর তার মধ্যে পেরেশানীও লজ্জা সৃষ্টি হল যে, ইয়া আল্লাহ! আমার দ্বারা কেমন ভুল হয়ে গেল।

এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে কিছু কালিমা শেখালেন এবং বললেন যে, এখন তুমি এই কালিমাগুলো বল :

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

"হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের উপর যুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের উপর দয়া না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।" (সূরা আ'রাফ : ২৩)

কুরআনে কারীমের মধ্যে মহান প্রভু বলেছেন যে, এ কথাগুলো আমি আদমকে শিখিয়েছি। এটাও তো মহান আল্লাহর কুদরতের মধ্যে ছিল যে, এ কথাগুলো তাঁকে শেখানো ব্যতীত এবং তাঁর মাধ্যমে বলানো ব্যতীত এমনিতেই মাফ করে দিতেন আর তাঁকে বলে দিতেন যে, আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমনটি করেননি। কেন? আমাদের হযরত ডা: আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন : আল্লাহ তাআলা এ সবকিছু করিয়ে তাঁকে বাতলে দিলেন : যে দুনিয়াতে তুমি যাচ্ছ সেখানে এই সবকিছু হবে। সেখানেও শয়তান তোমাদের কাছে আসবে। নফসও লেগে থাকবে। তোমাদের দ্বারা গুনাহ করাবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর বিরুদ্ধে নিজের সাথে প্রতিষেধক নিয়ে না যাবে, অতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে সঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবে না। সেই প্রতিষেধক হল "ইসতিগফার" এবং "তাওবা"। এজন্য ভুল ও ইসতিগফার উভয়টি তাঁকে শিখিয়ে বলেছেন : এবার তুমি যাও দুনিয়াতে।

আর এই প্রতিষেধকও খুব সহজ, মুখে ইসতিগফার করবে তো ইনশাআল্লাহ ঐ গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

"তাওবা" তিনটি জিনিসের সমষ্টি

সাধারণত: দুটো শব্দ ব্যবহৃত হয়। একটি হল "ইসতিগফার" আর অপরটি হল "তাওবা"। এর মধ্যে আসল হল "তাওবা"। আর "ইসতিগফার" হল ঐ তাওবা পর্যন্ত যাওয়ার পথ। আর এ "তাওবা" হল তিন জিনিসের সমষ্টি। যতক্ষণ পর্যন্ত এ তিনটা জিনিস পাওয়া না যাবে, অতক্ষণ পর্যন্ত "তাওবা" পরিপূর্ণ হবে না।

একটি হল যে গুনাহ হয়ে গেছে তার উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়ত: ঐ গুনাহটাকে ফিলহাল ছেড়ে দিবে। আর তৃতীয়ত: আগামীতে গুনাহটি না করার পাক্কা ইচ্ছা থাকতে হবে। এ তিনটি বস্তু একসাথে পাওয়া গেলেই তাওবা পরিপূর্ণ হবে। আর যখন তাওবা করে নিল তো ঐ তাওবাকারী ব্যক্তি গুনাহ থেকে পাক হয়ে গেল।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ

অর্থাৎ "গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মত হয়ে যায় যার কোন গুনাহ নেই"। (সুনানে ইবনে মাজাহ, তাওবা অধ্যায় হাদীস নং ৪৩০৪)

আল্লাহ তাআলা যে শুধু তার তাওবা কবূল করেন তাই নয়, আল্লাহ তাআলার দয়া ও মায়া দেখুন। তাওবাকারীর আমলনামা থেকেই ঐ গুনাহটি মিটিয়ে দেন। আখেরাতে ঐ গুনাহের আলোচনাই হবে না যে, ঐ বান্দা অমুক সময় অমুক গুনাহ করেছে।

"কিরামান কাতিবীন" এর মধ্যে একজন আমীর আর অপরজন মামূর

একটি কথা আমি আমার শাইখ থেকে শুনেছি। কোন কিতাবে দেখিনি। সেটা হল প্রত্যেক মানুষের সাথে এই যে দু'জন ফেরেশতা থাকেন যাঁদেরকে "কিরামান কাতিবীন" বলা হয়। যাঁরা মানুষের ভাল মন্দ লিপিবদ্ধ করেন। ডান দিকের ফেরেশতা নেকী লিখেন। আর বাম দিকের ফেরেশতা গুনাহ লিখেন।

তো আমার শাইখ বলেন যে, আল্লাহ তাআলা ডান দিকের ফেরেশতাকে বাম দিকের ফেরেশতার আমীর বানিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হল, যেখানে দু'জন কাজ করবে সেখানে একজন আমীর হবে আর অপরজন মামূর হবে। এ জন্য যখন কোন মানুষ কোন নেক আমল করে তখন ডান দিকের ফেরেশতা সঙ্গে সঙ্গে সেই নেকীটাকে লিখে ফেলেন। কেননা তাঁর নেকী লেখার জন্য অন্য ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু তিনি আমীর। আর বাম দিকের ফেরেশতা যেহেতু ডান দিকের ফেরেশতার অধীন। এজন্য যখন বান্দা কোন গুনাহ করে তখন বাম দিকের ফেরেশতা ডান দিকের ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করেন ঐ বান্দা অমুক গুনাহ করেছে সেটাকে লিখব নাকি লিখব না? তো ডান দিকের ফেরেশতা বলেন :

না। এখনই লিখ না। এখন একটু বিলম্ব কর। হতে পারে এ বান্দা তাওবা করবে। লিখে ফেললে সেটা আবার মিটাতে হবে। কিছুক্ষণ পর পুনরায় জিজ্ঞেস করেন : এখন লিখব? তিনি বলেন : থাম। হতে পারে সে তাওবা করবে। এরপর যখন তৃতীয়বার এ ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, আর বান্দা তখনো পর্যন্ত তাওবা করে না থাকে, তখন সেই ফেরেশতা বলেন : এবার লিখ।

শতবার তাওবা করলেও ফিরে আসো

আল্লাহ তাআলার রহমত হচ্ছে এই যে, তিনি বান্দাকে গুনাহের পর সুযোগ দেন যাতে করে সে গুনাহ হতে তাওবা করে। ক্ষমা চায়। যেন তার আমলনামায় গুনাহ লেখাই না হয়। কিন্তু কেউ তাওবা না করলে গুনাহ লিখে দেয়া হয়। আর সেটা লেখার পরও মৃত্যু পর্যন্ত দরওয়াযা উন্মুক্ত, যখন ইচ্ছা তাওবা কর। সেটাকে নিজের আমলনামা থেকে মিটিয়ে নাও।

একবার যখন সাচ্চা দিলে তাওবা করবে, তখন সেই গুনাহ তোমার আমলনামা থেকে মিটিয়ে দেয়া হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ না হবে, ঐ সময় পর্যন্ত তাওবার দারওয়াযা উন্মুক্ত। "আল্লাহু আকবার" কত দয়ালু ও উদার সত্তার দরবার।

কবি বলেছেন :

باز آ باز آ ہرآنچہ ہستی باز آ
از کفر و کبر وبت پرستی بازآ
ایں درگہ ما درگہ نوامیدی نیست
صدبار گر توبہ شکستی بازآ

ফিরে আসো ফিরে আসো তুমি যে-ই হও ফিরে আসো।
কুফরী, অহংকার ও মূর্তিপূজা থেকে ফিরে আসো।
এই দরবারে আমার দরবারে কোন নৈরাশ্য নেই।
শতবার তাওবা ভঙ্গ করলেও ফিরে আসো।

রাত্রে শোয়ার পূর্বে তাওবা করে নিন

আমাদের একজন বুযুর্গ ছিলেন বাবা নাজম আহসান ছাহেব রহ.। যিনি হযরত থানভী রহ.-এর খলীফা ছিলেন। বড় অদ্ভূত প্রকৃতির বুযুর্গ ছিলেন। যারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তারা তাঁর মাকাম সম্পর্কে অবগত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বড় অত্যাশ্চর্য বুঝশক্তি ও বিচক্ষণতা দান করেছিলেন। খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। একদিন তিনি তাওবার উপর বয়ান করছিলেন। আমিও কাছে বসা ছিলাম। এক যুবকও ঐ মজলিসে এসে গিয়েছিলেন। তিনি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। কিন্তু এই আল্লাহওয়ালাগণ তো সব সময় শিখানো এবং তারবিয়্যত করার ফিকিরে থাকতেন। ফলে তিনি ঐ যুবককে বললেন : "মিঞা! লোকেরা মনে করে এই দ্বীন খুব কঠিন। আরে এ দ্বীন মোটেও কঠিন নয়। ব্যস রাত্রে বসে আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করবে। এটাই পূর্ণ দ্বীন"।

গুনাহের আশংকা দৃঢ় ইচ্ছার বিপরীত নয়

ঐ যুবক চলে যাওয়ার পর আমি বললাম, হযরত! এই তাওবা বড় অদ্ভূত জিনিস। কিন্তু অন্তরে একটি খটকা আছে, যে কারণে অস্থিরতা থাকে। তিনি বললেন : সেটা কী? আমি বললাম, হযরত! তাওবার তিনটি শর্ত। একটি হল অন্তরে অনুশোচনা আসবে। দ্বিতীয় হল সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুনাহ ছেড়ে দিবে। তৃতীয় হল ভবিষ্যতের জন্য মযবূত এরাদা করবে যে, আগামীতে আর কখনো এই গুনাহ করব না। এর মধ্য থেকে প্রথম দু'টি বিষয়ে আমল তো সহজ। কেননা গুনাহের উপর অনুতাপ হয় আর গুনাহটা ঐ সময় ছেড়েও দেয়া হয়। কিন্তু তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ আগামীতে ঐ গুনাহটি না করার ব্যাপারে "আযম" বা পাক্কা এরাদা করা এটা তো দারুণ কঠিন। আর বুঝাও যায় না যে, এই পাক্কা এরাদাটা সঠিক না বেঠিক। আর যখন এরাদা ঠিক হয়নি, তাহলে তাওবাও শুদ্ধ হয়নি। এদিকে যেহেতু তাওবা শুদ্ধ হয়নি তাই ঐ গুনাহটি অবশিষ্ট থাকার এবং সেটা মাফ না হওয়ার পেরেশানী থাকে।

উত্তরে হযরত বাবা নাজম আহসান ছাহেব রহ. বললেন : যাও মিঞাঁ, তোমরা তো আযম বা 'দৃঢ় ইচ্ছা' কথাটার মর্মও বুঝ না। আযম বা দৃঢ় ইচ্ছার মর্ম হল, নিজের পক্ষ থেকে এই ইচ্ছা পোষণ করবে যে, আগামীতে এ গুনাহটি করব না। এখন যদি এই ইচ্ছা করার সময় অন্তরে এমন আশংকা থাকে যে, জানি না আমি আমার এই সংকল্পের উপর অটল থাকতে পারব কি? তাহলে এই শংকা বা আশংকা ঐ দৃঢ়তার পথে প্রতিবন্ধক নয়। আর এই আশংকার কারণে তাওবায় কোন সমস্যা হবে না। শর্ত হল নিজের পক্ষ থেকে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করতে হবে।

আর অন্তরে এই যে আশংকা লেগে থাকে এর চিকিৎসা হল এই যে, তাওবা করার সাথে সাথে মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করবে ইয়া আল্লাহ! আমি তাওবা করছি। আর আগামীতে গুনাহটি না করার ব্যাপারে পাক্কা ইচ্ছা পোষণ করি, কিন্তু আমি কি? আর আমার দৃঢ় ইচ্ছাই বা কি? আমি দুর্বল, জানা নেই আমি এই দৃঢ় ইচ্ছার উপর অটল থাকতে পারব কি? ইয়া আল্লাহ! আপনিই আমাকে এই দৃঢ় ইচ্ছার উপর দৃঢ়পদ রাখুন, আপনিই আমাকে অটলতা ও দৃঢ়তা নসীব করুন।

এভাবে দু'আ করলে ঐ শংকা বা আশংকা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, যে সময় হযরত বাবা ছাহেব রহ. এ কথাটা বলেছেন, এরপর থেকে অন্তরে শীতলতা এসে গেছে।

হতাশ হবেন না

হযরত সারী সাকাতী রহ. যিনি অনেক বড় একজন বুযুর্গ ছিলেন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী রহ. এর শাইখ ছিলেন। তিনি বলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহ করতে তোমার ভয় লাগে। আর গুনাহ করলে অন্তরে অনুতাপ সৃষ্টি হয়, অতক্ষণ পর্যন্ত হতাশ হওয়া জায়িয নেই। তবে হ্যাঁ এটা খুবই আশংকাজনক ব্যাপার যে, অন্তরে থেকে গুনাহের

ভয়ও মুছে গেল। আর গুনাহ করার পর অন্তরে কোন অনুতাপও সৃষ্টি হল না। আর মানুষ গুনাহের উপর বাহাদুরী দেখাতে থাকল এবং ঐ গুনাহকে বৈধ করার জন্য নানা হীলা বাহানা আরম্ভ করে দিল। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে অনুতাপ সৃষ্টি হয়, অতক্ষণ পর্যন্ত হতাশ হওয়ার কোন পথ নেই।

আমাদের হযরত ডা: আব্দুল হাই আরেফী রহ. এ কবিতাটি পাঠ করতেন :

سوئے نوامیدی مرو کہ امید ہاست
سوئے تاریکی مرو کہ خور شید ہاست

অর্থাৎ, হতাশার পথে যেওনা, কেননা আশার পথ অগণিত। অন্ধকারের পথে যেওনা কেননা সূর্যসংখ্যা অসংখ্য।

কাজেই তাওবা করে নাও তো সব গুনাহ খতম হয়ে যাবে।

শয়তান নৈরাশ্য সৃষ্টি করে

আর যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাওবার দরওয়াযা উন্মুক্ত রেখেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আবার হতাশা কিসের? এই যে মাঝে মধ্যে আমাদের অন্তরে এই খেয়াল আসে যে, আমরা তো মরদূদ হয়ে গেছি আমাদের দ্বারা কোন আমল হয় না, গুনাহে লিপ্ত। এই খেয়ালের পর অন্তরে নৈরাশ্য ছেয়ে যায়।

মনে রাখবেন এই নৈরাশ্য সৃষ্টি করাও শয়তানের একটি কৌশল। কেননা শয়তান অন্তরে নৈরাশ্য সৃষ্টি করে মানুষকে আমলহীন বানাতে চায়।

আরে তুমি এটা দেখ, যে বান্দার মালিক এত মহান দয়ালু ও পরম করুণাময় যে, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার পথ উন্মুক্ত রেখেছেন আর এই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন যে, যে বান্দা তাওবা করবে, তার

গুনাহগুলো আমলনামা থেকেও মিটিয়ে দিবেন। তারপরও কি এই বান্দা হতাশ হতে পারে?

এই হতাশার কোন প্রয়োজন নেই। ব্যস, খালেস দিলে তাওবা ও ইসতিগফার করবে। সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

তাওবার কারণে মুহূর্তের মধ্যে সব গুনাহ উড়ে যায়

আরে এ সব গুনাহের হাকীকত কি? তাওবার মাধ্যমে এক মিনিটে সবকিছু উড়ে যায়। যত বড় গুনাহই হোক না কেন।

হযরত বাবা নাজম আহসান ছাহেব রহ. খুব উঁচু মাপের কবি ছিলেন। তাঁর কবিতাগুলো আমাদের মত মানুষের জন্য খুব সান্ত্বনার কবিতা হত। তাঁরই একটি কবিতা :

دولتیں مل گئیں ہیں آہوں کی
ایسی تیسی میرے گناہوں کی

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ তাআলা আহ্ উহ্ করার দৌলত দান করেছেন যে, অন্তর অনুতাপ এর আগুনে দগ্ধ হচ্ছে, আর মানুষ মহান আল্লাহর শাহী দরবারে স্বীয় গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছে, তাহলে এই গুনাহ আমাদের কী ক্ষতি করবে?

সুতরাং যখন তাওবার রাস্তা খোলা, তো নৈরাশ্যের কোন স্থান এখানে নেই।

ইসতিগফারের মর্ম

যাইহোক "তাওবা"র তিনটি শর্ত। এগুলো ছাড়া তাওবা পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয় জিনিস হল "ইসতিগফার"। এই ইসতিগফার তাওবার তুলনায় ব্যাপক। ইসতিগফারের মর্ম হল, আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফিরাতের দু'আ করা।

হযরত ইমাম গাযালী রহ. বলেন : "ইসতিগফার" এর মধ্যে এ তিনটি জিনিস শর্ত নয় বরং ইসতিগফার প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে

করতে পারে। যখনই কোন ভুল হবে বা অন্তরে কোন কুমন্ত্রণা আসবে অথবা ইবাদতে কমতি হবে অথবা যে কোন ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ পাবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইসতিগফার করবে এবং বলবে যে,

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ إِلَيْهِ

এমন ব্যক্তি কি হতাশ হয়ে যাবে?

ইমাম গাযালী রহ. বলেন : মু'মিনের প্রকৃত পথ তো এটাই যে, সে তাওবা করবে। এবং উল্লেখিত শর্তত্রয় এর সাথে করবে, কিন্তু অনেক সময় কোন কোন মানুষ অনেকগুলো গুনাহ ছেড়ে দেয়। আর যে সব গুনাহে সে লিপ্ত, সেগুলো বর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা রত থাকে। কিন্তু একটি গুনাহ এমন আছে, যা ছাড়ার জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও সক্ষম হচ্ছে না। বরং অবস্থা বা পরিবেশের প্রভাবে সে প্রভাবিত। আর ঐ গুনাহটি বর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হল এই যে, তাহলে কি এ ব্যক্তি তাওবা থেকে হতাশ হয়ে বসে পড়বে? এটা মনে করে যে আমি তো ঐ গুনাহ বর্জনে সক্ষম নই!! কাজেই আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি।

হারাম উপার্জনকারী ব্যক্তি কী করবে?

উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তি ব্যাংকে চাকুরী করে। আর ব্যাংকের চাকুরী নাজায়িয ও হারাম। কারণ হল সুদের আমদানী। এখন এই মানুষটা যখন দ্বীনের পথে আসল, আর ধীরে ধীরে সে অনেক গুনাহ ছেড়ে দিয়েছে। নামায-রোযা আরম্ভ করেছে, শরীয়তের অন্যান্য বিধি বিধানের উপরও আমল শুরু করে দিয়েছে। এখন সে আন্তরিকভাবেই আকাংখা করে কিভাবে হারাম আমদানী থেকে বাঁচতে পারি। আর ব্যাংকের চাকুরী ছেড়ে দিব। কিন্তু তার স্ত্রী সন্তান আছে। তাদের জীবিকা নির্বাহ এবং হুকূকের দায়িত্বও তার কাঁধে। এখন যদি সে চাকুরী ছেড়ে দেয়, তাহলে পেরেশানী ও কষ্টে নিপতিত হওয়ার আশংকা। যদ্দরুন সে ব্যাংকের চাকুরী ছাড়তে সক্ষম হচ্ছে না। অবশ্য

সে অন্য বৈধ চাকুরীর সন্ধান করছে। (বরং আমি তো বলি যে, এ ব্যক্তি অন্য চাকুরী এমনভাবে সন্ধান করবে, যেমনিভাবে একজন রোযগারহীন মানুষ চাকুরীর সন্ধান করে।)

তো এমন ব্যক্তি কি হতাশ হয়ে বসে পড়বে? কারণ অপারগতার দরুন চাকুরী ছাড়তে পারছে না আর ছাড়ার দৃঢ় ইচ্ছাও করতে পারছে না। অথচ তাওবার জন্য গুনাহ পরিত্যাগ করার পাক্কা ইচ্ছা করা শর্ত। তবে কি এমন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য তাওবার কোন পথ খোলা নেই?

তাওবা নাই তো ইসতিগফার করবে

ইমাম গাযালী রহ. বলেন : এমন ব্যক্তির জন্যও পথ আছে। সেটা হল অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জায়েয এবং হালাল রুযীর ব্যবস্থা না হবে, অতক্ষণ পর্যন্ত চাকুরী ছাড়বে না। কিন্তু সাথে সাথে এর উপর ইসতিগফারও করতে থাকবে। ঐ সময় তাওবা করতে পারবে না। কেননা তাওবার জন্য গুনাহ ছেড়ে দেয়া পূর্বশর্ত আর এখানে সে চাকুরী ছাড়তে সক্ষম নয় এজন্য তাওবা হতে পারে না। অবশ্য মহান আল্লাহর নিকট ইসতিগফার করবে আর বলবে "হে আল্লাহ! এ কাজটাতো ভুল এবং গুনাহ। এর উপর আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। কিন্তু ইয়া আল্লাহ! আমি অপারগ, এ মুহূর্তে এটা ছাড়তেও পারছি না। আপনার রহমতে আমাকে মাফ করে দিন। এবং আমাকে এ গুনাহ থেকে নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দিন"।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন : যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, ইনশাআল্লাহ একদিন না একদিন তার গুনাহ ছেড়ে দেয়ার তাউফীক হয়েই যাবে।

তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ইসতিগফার করে সে গুনাহের উপর অটল ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে না"।

(তিরমিযী শরীফ কিতাবুদ দাওয়াত অধ্যায় ১১৯ হাদীস নং ৩৫৫৪)

এ ব্যাপারটাকেই কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এভাবে বয়ান করেছেন :

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۪ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪۟ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝١٣٥

অর্থাৎ, "যাঁরা আল্লাহর নেক বান্দা, তাদের দ্বারা কোন গুনাহ হয়ে গেলে অথবা তারা নিজেদের উপর যুলুম করে ফেললে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং স্বীয় গুনাহের উপর ইসতিগফার করে। আর কে আছে আল্লাহ ছাড়া যে গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা যে গুনাহ করেছে জেনে শুনে সে গুনাহের উপর হঠকারিতা প্রদর্শন করে না।" (সূরা আলে ইমরান : ১৩৫)

এজন্য সব সময় ইসতিগফার করতেই থাকবে। কোন গুনাহ ছাড়ার উপর সক্ষম না হলেও ইসতিগফার পরিত্যাগ করবে না।

কোন কোন বুযুর্গ তো এ পর্যন্ত বলে দেন যে, যে জমিনে গুনাহ করেছে ঐখানেই ইসতিগফারও করবে। যাতে করে যখন ঐ জমিন তোমার গুনাহের সাক্ষ্য দিবে তখন সে এর পাশাপাশি তোমার ইসতিগফারের সাক্ষ্যও দিবে যে, এই বান্দা আমাদের সামনে ইসতিগফারও করেছিল।

ইসতিগফারের উত্তম শব্দাবলী

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কুরবান হয়ে যান। তিনি ইসতিগফারের জন্য উম্মতকে এমন সব শব্দ শিখিয়ে গেছেন যদি কোন মানুষ নিজ বুদ্ধি বিবেক দ্বারা চিন্তা করে এসব শব্দ পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টাও করত, তবুও পৌঁছতে পারত না। তাইতো তিনি ইরশাদ করেছেন :

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَنَّا وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা মারওয়ার মাঝে সাঈ করার সময় যখন দুই সবুজ পিলার অতিক্রম করতেন তখন এ দু'আটি পাঠ করতেন অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন এবং আমার উপর রহম করুন আর আপনার ইলমে আমার যে গুনাহসমূহ আছে সেগুলোও মাফ করে দিন। কেননা আপনার ইলমে আমাদের ঐসব গুনাহও আছে যেগুলো সম্পর্কে আমাদেরও জানা নেই। নিঃসন্দেহে আপনিই সব থেকে বেশি সম্মানিত ও মর্যাদাবান"।

দেখুন অনেকগুলো গুনাহ আছে এমন যেগুলো বাস্তবে গুনাহ, কিন্তু সে কাজগুলো যে গুনাহ সে অনুভূতিও আমাদের নেই। আবার অনেক সময় জানা থাকে না। এখন মানুষ এরকম কয়টা গুনাহ গণনা করবে?

এজন্য দু'আর মধ্যে বলে দিয়েছেন যত গুনাহ আপনার ইলমে আছে, ইয়া আল্লাহ! ঐসব মাফ করে দিন।

সায়্যিদুল ইসতিগফার

"সায়্যিদুল ইসতিগফার" বা ইসতিগফার এর সরদারকে মুখস্থ করতে পারলে খুবই ভাল, এটাকে পাঠ করুন এবং অভ্যাসে পরিণত করুন।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

যার অর্থ হল : "হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। এবং আমি আমার সামর্থ্য অনুসারে আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর আছি। আমি যা কিছু করেছি সেটার অনিষ্টতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আপনি আমাকে যে সব নেয়ামত দান করেছেন সেগুলো সহ আপনার কাছে রুজু করছি এবং আমার গুনাহ থেকেও আপনার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি। সুতরাং

আপনি আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন। কেননা আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩০৬)

যদি কেউ সকালবেলা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে এটা পাঠ করে, তাহলে সন্ধ্যার পূর্বে তার ইন্তিকাল হয়ে গেলে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। আর যদি কেউ সন্ধ্যাবেলা পড়ে আর সকালের পূর্বে তার ইন্তিকাল হয় তাহলে সোজা জান্নাতে চলে যাবে।

এজন্য সকাল-সন্ধ্যা এই সায়্যিদুল ইসতিগফার পাঠ করার মা'মূল বানিয়ে নিন। বরং প্রত্যেক নামাযের পর এটাকে একবার পাঠ করে নিন। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে "সায়্যিদুল ইসতিগফার" উপাধি দিয়েছেন। অর্থাৎ এটা সমস্ত ইসতিগফারের সরদার বা নেতা। ইসতিগফারের এই শব্দগুলো যখন মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখাচ্ছেন আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখাচ্ছেন তাঁর উম্মতকে, তাহলে বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ এই ইসতিগফারের মাধ্যমে নিজ বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করতে চান ও মাফ করতে চান।

এজন্য এটাকে আপনাদের মা'মূলাতের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করবেন। চাইলে ইসতিগফারের আরো সংক্ষিপ্ত শব্দও মুখস্থ করতে পারেন।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ

আর যদি শুধু أَسْتَغْفِرُ اللهَ-ই পড়ে তাও ঠিক আছে।

একটি চমৎকার হাদীস

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

অর্থাৎ, “ঐ সত্তার কসম যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমরা একদম গুনাহ না করো তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়ে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহ করবে অতঃপর ইসতিগফার করবে। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।” (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৪৯)

মানুষের মধ্যে গুনাহের যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন

এই হাদীসের মাধ্যমে এ কথার দিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যদি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এটাই হত যে, আমি এমন মাখলূক সৃষ্টি করব যার মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতাই নেই, তাহলে মানুষ সৃষ্টির কোন প্রয়োজনই ছিল না। সেজন্য তো ফেরেশতারাই যথেষ্ট ছিলেন। কেননা তাঁরা এমন মাখলূক যাঁরা সব সময় আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও ইবাদতেই মাশগুল থাকেন, তাঁর তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনায় লিপ্ত থাকেন। তাঁদের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতাই নেই। চাইলেও তাঁরা গুনাহ করতে পারেন না।

কিন্তু মানুষ হল এমন এক মাখলূক যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ভালো-মন্দ উভয় স্বভাব গচ্ছিত রেখেছেন। উদ্দেশ্য ছিল যেন মানুষের মধ্যে গুনাহের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। আর কখনো গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করবে। এখন যদি মানুষ এই আমল না করে, তাহলে তাকে সৃষ্টি করারই কী প্রয়োজন ছিল? সেজন্য তো ফেরেশতারাই যথেষ্ট ছিলেন।

তাইতো যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হচ্ছিল, তখন ফেরেশতারা এ কথাই বলেছিলেন যে, “ইয়া আল্লাহ! এটা আপনি কোন্ মাখলূক সৃষ্টি করছেন যারা পৃথিবীতে খুনোখুনি করবে, ফাসাদ করবে। অথচ আমরা দিন রাত আপনার তাসবীহ পাঠ করছি ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি”।

তখন প্রতিউত্তরে আল্লাহ তাআলা বললেন :

إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ۝٣٠

"নিশ্চয়ই আমি ঐসব বিষয় জানি যা তোমরা জানো না।"

(সূরা বাকারাহ : ৩০)

এটা ফেরেশতাদের কোন কৃতিত্ব নয়

কেননা গুনাহ করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যখন এই মাখলূক গুনাহসমূহ থেকে দূরে থাকবে তখন তারা হে ফেরেশতারা! তোমাদের থেকেও আগে বেড়ে যাবে। কেননা তোমরা যে গুনাহসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছো এতে তোমাদের কোন কৃতিত্ব নেই। কেননা তোমাদের মধ্যে তো গুনাহ করার যোগ্যতাই নেই।

উদাহরণস্বরূপ : এক ব্যক্তি অন্ধ, সে দু চোখে কিছুই দেখে না। যদি সে গাইরে মাহরাম কাউকে না দেখে, ফিল্ম না দেখে, উলঙ্গ প্রকৃতির ছবি না দেখে, তাহলে এতে তার কৃতিত্ব কী? কেননা তার মধ্যে তো দেখার যোগ্যতাই নেই। দেখতে চাইলেও সে দেখতে পারবে না। পক্ষান্তরে অন্য এক ব্যক্তি যার দৃষ্টিশক্তি ভাল, প্রত্যেকটা জিনিস দেখার যোগ্যতা আছে, আর তার অন্তরে কুপ্রবৃত্তি উথলে উঠছে। কিন্তু পাপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সত্ত্বেও সে মহান আল্লাহর বান্দার হওয়ার খেয়াল করে নিজ চোখকে অবৈধ স্থানে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখছে। এটাই সেই মাকাম, যার উপর আল্লাহ তাআলা জান্নাত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে:

وَأَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ۝٤٠ فَإِنَّ ٱلۡجَنَّةَ هِيَ ٱلۡمَأۡوَىٰ ۝٤١

অর্থাৎ, "আর নিশ্চয়ই যে তার প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং স্বীয় নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে। নিশ্চয়ই জান্নাতই হল তার ঠিকানা।" (সূরা নাযিআত : ৪০-৪১)

জান্নাতের স্বাদসমূহ স্রেফ মানুষের জন্য

খুব বুঝে নিন, ফেরেশতারা যদিও জান্নাতে থাকে, কিন্তু জান্নাতের স্বাদসমূহ তাঁদের জন্য নয়। জান্নাতের আরামসমূহ তাঁদের জন্য নয়। কেননা তাঁদের মধ্যে জান্নাতের স্বাদ ও আরাম বুঝার মত মনই নেই। জান্নাতের স্বাদসমূহ মহান আল্লাহ ঐ মাখলূকের জন্যই সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে গুনাহেরও যোগ্যতা আছে আবার ভাল কাজের যোগ্যতাও আছে। আল্লাহ তাআলার নিপুণ হেকমত ও তাঁর ইচ্ছায় কে হস্তক্ষেপ করতে পারে?

তিনি তাঁর নিপুণ প্রজ্ঞা দ্বারা সমস্ত জগৎ এজন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে এ জগতে এমন মানুষ সৃষ্টি করেন, যার মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতাও আছে। কিন্তু সে নিজেকে গুনাহ থেকে হেফাযত করে। আর মানবীয় প্রকৃতির চাহিদায় কখনো গুনাহ হয়ে গেলে সে সঙ্গে সঙ্গে ইসতিগফার করে। আর এই ইসতিগফারের ফলে মানুষ মহান আল্লাহর গাফফারী, সাত্তারী ও তাঁর গাফূরুর রহীম হওয়ার পাত্রে পরিণত হয়। এখন যদি গুনাহই না হত, তাহলে মহান আল্লাহর গাফফারী কোথায় প্রকাশ পেত?

কুফরও হেকমতশূন্য নয়

আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন : এ জগতের কোন কিছু হেকমত ও ফায়েদাশূন্য নয়। এমনকি কুফরও হেকমতশূন্য নয়। তাইতো মাওলানা রূমী রহ. বলেছেন :

در کار خانہ عشق از کفر ناگزیر است
آتش کرابسوزد گر بولہب نباشد

অর্থাৎ এই কারখানায় কুফরেরও প্রয়োজন আছে। কেননা যদি আবূ লাহাব না হত অর্থাৎ কাফের না হত, তাহলে জাহান্নামের আগুন কাকে জ্বালাত?

অতএব গুনাহও মহান আল্লাহর ইচ্ছার একটি অংশ। আর এই গুনাহের চাহিদা বান্দার মধ্যে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে বান্দা এই

চাহিদাকে পদদলিত করে এবং জ্বালিয়ে দেয়। কেননা বান্দা এই চাহিদাকে যত পদদলিত করবে, যত জ্বালাবে, অতই তাঁর তাকওয়া পরিপূর্ণ হবে। আর তাকওয়ার নূর তার হাসিল হবে।

দুনিয়ার প্রবৃত্তি ও গুনাহ হল জ্বালানী কাঠ

আল্লাহ তাআলা মাওলানা রূমী রহ.কে উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে দারুণ যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি উদাহরণের সম্রাট ছিলেন। তিনি বলেন :

شہوت دنیا مثال گلخن است
کہ ازو حمّام تقوی روشن است

অর্থাৎ দুনিয়ার এ সব চাহিদা, কুপ্রবৃত্তি ও গুনাহ এ হিসেবে বড় কাজের জিনিস যে, মহান আল্লাহ এগুলোকে তোমাদের জন্য "ইন্ধন" বা জ্বালানী কাঠ হিসেবে দান করেছেন। যাতে করে তোমরা এ ইন্ধনকে জ্বালিয়ে তাকওয়ার গোসলখানাকে আলোকিত করতে পারো। কেননা তাকওয়ার গোসলখানা এই ইন্ধনের মাধ্যমেই আলোকিত হবে।

সুতরাং যখন গুনাহের খুব বেশি চাহিদা সৃষ্টি হবে, অন্তরে ঢেউ এর মত উথাল পাথাল করতে থাকবে, তখন তোমরা এই তাকাযা ও চাহিদাকে আল্লাহর জন্য পদপিষ্ট করে দিবে। যখন এটাকে পিষ্ট করবে ও পুড়িয়ে ফেলবে, তখন এর মাধ্যমে তাকওয়ার গোসলখানা আলোকিত হবে। এবং তাকওয়ার নূর হাসিল হবে। এখন যদি গুনাহের এই তাকাযা বা চাহিদাই না হত, তাহলে তোমাদের এই গোসলখানাকে আলোকিত করার ইন্ধন কোথা থেকে হাসিল হত?

ঈমানের মিষ্টতা

হাদীসে পাকের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে : "জনৈক ব্যক্তির অন্তরে বেগানা নারীর প্রতি কুদৃষ্টির চাহিদা সৃষ্টি হল। কিন্তু আল্লাহর ঐ বান্দা এই চাহিদা ও আগ্রহ সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ভয়ে নিজেকে কুদৃষ্টি

থেকে ফেরাল, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ঈমানের এমন মিষ্টতা দান করবেন যে, যদি সে দৃষ্টিপাত করত, তাহলে সে সেই স্বাদ পেত না।"

দেখুন এই গুনাহের চাহিদাই ঈমানের মিষ্টতা অর্জনের মাধ্যম হয়ে গেছে। যদি গুনাহের এই তাকাযা ও চাহিদা সৃষ্টি না হত, তাহলে ঈমানের স্বাদ হাসিল হত না।

গুনাহ সৃষ্টি করার হেকমত

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন আল্লাহ বান্দাকে দিয়ে গুনাহ করাতে চান না, তাহলে এই গুনাহ তিনি কেন সৃষ্টি করেছেন? এর উত্তর হল এই যে, ঐ গুনাহ সৃষ্টি করার মধ্যে মহান আল্লাহর দুটি হেকমত বা গুঢ়তত্ত্ব আছে, একটি হল যখন বান্দা পূর্ণ চেষ্টা করে ঐ গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যাপারে উদ্যোগী হবে, তখন তার অন্তরে তাকওয়ার নূর হাসিল হবে। এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল হবে। কেননা মানুষ যতই গুনাহ থেকে দূরে সরবে, ততই তার মর্যাদা উন্নত হতে থাকবে।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য নতুন রাস্তা খুলে দিবেন"। (সূরা তালাক : ২)

তাওবার মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি

কিন্তু নিজ পূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানবীয় প্রকৃতির তাড়নায় যদি মানুষ কোন স্থানে পদস্খলিত হয়ে পড়ে এবং গুনাহ করে নেয়, তো যখন ঐ গুনাহের উপর সে ইসতিগফার করবে এবং অনুতাপ ও লজ্জার সাথে মহান আল্লাহর কাছে সমর্পিত হয়ে বলবে :

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থাৎ "আমি আমার প্রভুর নিকট সমস্ত গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে রুজু করছি"।

এখন এই অনুশোচনা ও তাওবার বদৌলতে তার দারাজাত আরো বৃদ্ধি পাবে। আর সে মহান আল্লাহর গাফফারী ও সাত্তারীর প্রকাশস্থল হবে।

এ কথাগুলো খুব সংবেদনশীল। আল্লাহ তাআলা ভুল বুঝা হতে আমাদেরকে হেফাযত করুন, আমীন।

মনে রাখবেন, গুনাহের উপর কখনো দুঃসাহস দেখাবেন না। কিন্তু যদি গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে হতাশ হওয়াও ঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা তাওবা ও ইসতিগফারের পথ ও এজন্যই রেখেছেন যাতে মানুষ হতাশ হয়ে না পড়ে।

সুতরাং কখনো গুনাহ হয়ে গেলে কাল বিলম্ব না করে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করবে। তাওবা করবে। কান্নাকাটি করবে। তো এই ক্রন্দন ও অনুতাপের ফলে অনেক ক্ষেত্রে তার ঐ মাকাম হাসিল হবে যে, যদি গুনাহ না করত তাহলে সে ঐ মাকাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না।

হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানভী রহ. হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর একটি ঘটনা লিখেছেন। হযরত মুআবিয়া রাযি. দৈনিক তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতেন। একদিন তাহাজ্জুদের জন্য চোখ খোলেনি। এমনকি তাহাজ্জুদের সময় শেষ হয়ে গেছে। যেহেতু এর পূর্বে তাহাজ্জুদের নামায কখনো ছুটেনি। এই ছিল প্রথম ঘটনা, ফলশ্রুতিতে তিনি এত অনুতপ্ত ও বিষণ্ন হলেন যে, সারা দিন কাঁদতে কাঁদতে কাটিয়ে দিলেন যে, ইয়া আল্লাহ! আজ আমার তাহাজ্জুদ নামায ছুটে গেল!

পরবর্তী রাতে এক বুযুর্গ তাশরীফ আনলেন এবং তাঁকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগানো আরম্ভ করলেন আর বলতে লাগলেন : "উঠুন, তাহাজ্জুদ পড়ে নিন"।

হযরত মুআবিয়া রাযি. সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন। আর তাকে জিজ্ঞেস করলেন : "আপনি কে? এখানে কিভাবে আসলেন?" উত্তরে সে বলল : "আমি হলাম যুগের বদনাম ইবলীস ওরফে শয়তান"। হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন : "তোমার কাজ তো হল মানুষকে অলসতায় বিভোর রাখা, নামাযের জন্য উঠানোর সাথে তোমার কী সম্পর্ক"?

শয়তান বলল : "এ ব্যাপারে তর্ক বিতর্ক করবেন না। তাহাজ্জুদ পড়ুন ও নিজের কাজ করুন"। হযরত মুআবিয়া রাযি. বললেন : "না, আগে বল কী কারণ? আমাকে কেন উঠিয়েছ? না বলা পর্যন্ত আমি ছাড়ব না"।

অনেক পীড়াপীড়ির পর শয়তান বলল : "আসল ব্যাপার হল এই যে, গতরাত্রে আপনাকে আমি গাফলতের নিদ্রায় বিভোর করে দিয়েছিলাম যাতে আপনার তাহাজ্জুদ নামায ছুটে যায়। ফলে আপনার তাহাজ্জুদ ছুটে গেল। কিন্তু তাহাজ্জুদ ছুটে যাওয়ার কারণে আপনি সারা দিন কান্নাকাটি করলেন আর এই কান্নাকাটির ফলে আপনার মর্যাদা এত বেড়ে গেছে যে, যদি আপনি উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন, তাহলে আপনার মর্যাদা এত বৃদ্ধি পেত না। এটা অত্যন্ত অলাভজনক ব্যবসা হল। এ জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আপনাকে আজ তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠিয়ে দিব, যাতে আপনার মর্যাদা আর বৃদ্ধি না পায়"।

নতুবা অন্য মাখলূক সৃষ্টি করবেন

এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন বলেন : যদি মানুষ আন্তরিকভাবে তাওবা ও ইসতিগফার করে এবং মহান আল্লাহর নিকট নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে, তো অনেক সময় ঐ মানুষের মর্যাদা এত বেশি উচ্চ হয়ে যায় যে, মানুষ সেটা কল্পনাও করতে পারে না। এজন্য এ তাওবা ও ইসতিগফার অনেক বড় জিনিস।

এজন্যই এ হাদীসে পাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যদি সমস্ত মাখলূক গুনাহ পুরোপুরি বর্জন করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা অন্য কোন মাখলূক সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহ করবে অতঃপর মহান আল্লাহর সামনে তাওবা ও ইসতিগফার করবে, তো আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন"।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৪৯)

যাইহোক, এ হাদীসে পাকের দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ শিক্ষাই দান করেছেন যে, যদি কখনো ভুল হয়ে যায়, তাহলে হতাশ হবে না। বরং তাওবা ও ইসতিগফারের দিকে রুজু কর। অবশ্য নিজের পক্ষ থেকে গুনাহের পথে পা বাড়াবে না। বরং গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক চেষ্ট করবে। কিন্তু যদি গুনাহ হয়ে যায় তাহলে তাওবা ও ইসতিগফার করে নাও।

গুনাহ থেকে বাঁচা ফরযে আইন

অনেক সময় অন্তরে এমন খেয়াল আসে যে, তাহলে তো গুনাহ বর্জনের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। বরং গুনাহও করতে থাকো আর ইসতিগফার ও তাওবাও করতে থাকো!

খুব ভালভাবে বুঝে নিন যে, গুনাহ থেকে বাঁচা প্রত্যেক মানুষের যিম্মায় ফরযে আইন। আর তার জন্য জরুরী হল সে নিজেকে জীবনের প্রতিটি ধাপে সব ধরনের গুনাহ থেকে হেফাযত করবে। কিন্তু যদি মানবীয় প্রকৃতির তাকাযায় কখনো গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে হতাশ হবে না বরং তাওবা করবে। অথবা অন্য কোন ব্যক্তি কোন গুনাহে লিপ্ত আর তার জন্য কোন কারণে সেটা বর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ : ব্যাংকে চাকুরী করে, তাহলে এমতাবস্থায় সে এমনভাবে অন্য চাকুরীর সন্ধান করবে, যেমনভাবে একজন বেকার মানুষ চাকুরী তালাশ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তাওবা ও ইসতিগফারও অব্যাহত রাখবে।

অসুস্থতার মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি

অথবা উদাহরণস্বরূপ আপনি এ হাদীস শুনে থাকবেন যে, যখন মানুষ অসুস্থ হয়, তখন তার গুনাহ মাফ হয়। এবং এর মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। অসুস্থতা যত মারাত্মক হবে, মর্যাদা ততই বৃদ্ধি পাবে।

তাই বলে কি হাদীসের মর্ম এমন যে, মানুষ আল্লাহ পাকের নিকট রোগ কামনা করবে? অথবা অসুস্থ হওয়ার চেষ্টা করবে? এ কথা চিন্তা করে যে, অসুস্থ হলে আমার গুনাহ মাফ হবে, মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

বলাবাহুল্য যে, অসুস্থতা এমন কোন বস্তু নয় যেটার কামনা করা হয়, যেটা অর্জনের জন্য চেষ্টা চালানো হয়, যার আকাংখা করা হয়। বরং হাদীসে পাকে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ তাআলার নিকট সুস্থতা কামনা কর, কখনো রোগ কামনা করবে না। তবে ইচ্ছার বিপরীতে রোগ এসে গেলে সেটাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মনে করবে। আর এটাই ভাববে যে, এর মাধ্যমে আমার গুনাহ মাফ হচ্ছে এবং আমার দারাজাত বুলন্দ হচ্ছে।

ঠিক অনুরূপ গুনাহও কোন করার জিনিস নয় বরং বিরত থাকার জিনিস। কিন্তু কখনো পরিস্থিতির তাকাযায় বাধ্য হয়ে গুনাহ করে ফেললে মানুষ তাওবা ও ইসতিগফারের দিকে রুজু করবে। ফলশ্রুতিতে তার দারাজাত বুলন্দ হবে। এই হল ইসতিগফারের হাকীকত।

তাওবা ও ইসতিগফার তিন প্রকার

অতঃপর তাওবা ও ইসতিগফার তিন প্রকার

১। গুনাহসমূহ থেকে তাওবা ও ইসতিগফার।

২। নেককাজ ও ইবাদাতে সংঘটিত ত্রুটি বিচ্যুতি হতে ইসতিগফার।

৩। স্বয়ং ইসতিগফার হতে ইসতিগফার। অর্থাৎ যেহেতু আমরা ইসতিগফারের হক আদায় করতে পারিনি এজন্য এর থেকেও আমরা ইসতিগফার করছি।

তাওবার পূর্ণতা

প্রথম প্রকার অর্থাৎ গুনাহসমূহ থেকে ইসতিগফার করা প্রত্যেক মানুষের উপর ফরযে আইন। কোন মানুষ এর ব্যতিক্রম নেই। প্রত্যেক মানুষ নিজ অতীত গুনাহের উপর ইসতিগফার করবে। এটাই কারণ যে, তাসাওউফ ও তরীকতে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল "তাকমীলে তাওবা" বা তাওবার পূর্ণতা। পরবর্তী সমস্ত স্তর "তাকমীলে তাওবা"র উপর নির্ভরশীল। তাওবায় পূর্ণতা সাধন না হলে সামনে কিছুতেই অগ্রসর হতে পারবে না।

তাইতো যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় সংশোধনের উদ্দেশ্যে কোন বুযুর্গের কাছে যায়, তখন ঐ বুযুর্গ সর্বপ্রথম তাওবার তাকমীল করান।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন :

هُوَ اَوَّلُ إِقْدَامِ الْمُرِيْدِيْنَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন শাইখের নিকট মুরীদ হওয়ার জন্য যাবে তার প্রথম কাজ হল 'তাকমীলে তাওবা'। শাইখের হাতে যে বাইআত হয় সেটা মূলত তাওবারই বাইআত। বাইআতের সময় মুরীদ স্বীয় অতীতের গুনাহগুলো থেকে তাওবা করে। আর আগামীতে গুনাহ না করার শপথ করে। অতঃপর শাইখ তার তাওবার তাকমীল করান।

সংক্ষিপ্ত তাওবা

মাশায়েখ হযরতগণ বলেন : তাকমীলে তাওবার দুটি স্তর আছে। একটি হল "এজমালী তাওবা" বা সংক্ষিপ্ত তাওবা আর অপরটি হল "তাফসীলী তাওবা" বা বিস্তারিত তাওবা। তাওবায়ে এজমালীর মর্ম হল : মানুষ একবার নিশ্চিন্ত মনে বসে নিজ অতীত জীবনের সমস্ত গুনাহের কথা সংক্ষেপে স্মরণ করে ঐসব থেকে আল্লাহ পাকের নিকট তাওবা করবে।

তাওবায়ে এজমালীর উত্তম পন্থা হল, সর্ব প্রথম সালাতুত তাওবার নিয়্যতে দু রাকাআত নামায পড়বে। অতঃপর মহান আল্লাহর শাহী

দরবারে খুব কাকুতি-মিনতি, বিনয়-নম্রতা, অনুতাপ ও দগ্ধতার সাথে এক একটি গুনাহকে স্মরণ করে এই দু'আ করবে : হে আল্লাহ! এখন পর্যন্ত আমার দ্বারা যত গুনাহ হয়েছে, চাই প্রকাশ্য গুনাহ হোক বা অপ্রকাশ্য, আল্লাহর হক সংশ্লিষ্ট হোক বা বান্দার হক সংশ্লিষ্ট, ছোট হোক বা বড়, হে আল্লাহ! আমি এই সব গুনাহ থেকে তাওবা করলাম। এটা এজমালী তাওবা হল।

তাফসীলী তাওবা

কিন্তু তাওবায়ে এজমালীর মর্ম এটা নয় যে, এখন সে সম্পূর্ণ পাক সাফ হয়ে গেছে। এখন কিছু করতে হবে না, বরং এরপর তাফসীলী তাওবা জরুরী। সেটা এভাবে যে, যে সব গুনাহের ক্ষতিপূরণ সম্ভব, সেগুলোর ক্ষতিপূরণ আরম্ভ করে দিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেগুলোর ক্ষতিপূরণ না করবে, অতক্ষণ পর্যন্ত তার তাওবা পরিপূর্ণ হবে না।

উদাহরণস্বরূপ, ফরয নামাযসমূহ ছুটে গিয়েছিল, এখন যখন নামায ছুটে যাওয়ার কথা মনে পড়েছে তো তাওবা করে নিয়েছে। কিন্তু জীবদ্দশায় মারা যাওয়ার পূর্বে এইসব নামাযের কাযা ওয়াজিব। আর যদি তাওবা করে নিশ্চিন্ত মনে বসে পড়ে, আর নামাযগুলো কাযা না করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাওবা পরিপূর্ণ হবে না। কেননা যে সব গুনাহের ক্ষতিপূরণ সম্ভব ছিল, সে সেটার ক্ষতিপূরণ করেনি।

এজন্য ইসলাহ তথা আত্মসংশোধনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল পরিপূর্ণ তাওবা করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না করবে, অতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন সম্ভব নয়।

নামাযের হিসাব করুন

তাওবায়ে তাফসীলীর ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হিসাব হল নামাযের। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত যত নামায কাযা হয়েছে, সেগুলো হিসাব করুন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার অর্থ হল ছেলেদের ক্ষেত্রে

স্বপ্নদোষ হওয়া। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব হওয়া। কিন্তু যদি কারো মধ্যে এসব আলামত প্রকাশ না পায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে যে দিন (চান্দ্র বছর হিসেবে) পনের বছর পূর্ণ হবে, ঐ দিন থেকে সে প্রাপ্তবয়স্ক বলে গণ্য হবে। চাই ছেলে হোক বা মেয়ে। ঐ দিন থেকে তার উপর নামাযও ফরয, রোযাও ফরয। অন্যান্য দ্বীনী ফরযও তার দায়িত্বে চলে আসবে।

এজন্য মানুষ সর্বপ্রথম এ হিসাব করবে যে, আমি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কী পরিমাণ নামায কাযা হয়েছে। অনেক মানুষ তো মাশাআল্লাহ দ্বীনদার ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছে। আর ছেলেবেলা থেকেই পিতামাতা নামাযে অভ্যস্ত করিয়েছেন। যে কারণে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন নামাযই কাযা হয়নি।

যদি অবস্থা এমন হয় তাহলে সুবহানাল্লাহ। আর একটি মুসলিম ঘরের পরিবেশ এমনই হওয়া উচিত। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “বাচ্চা সাত বছর বয়সে উপনীত হলে তাকে নামাযের নির্দেশ দাও। আর দশ বছরে উপনীত হলে মারধর করে হলেও নামায পড়াও”। (আবূ দাউদ শরীফ ১:৭৭)

কিন্তু যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর উদাসীনতার কারণে নামায ছুটে যায়, তাহলে সেটার ক্ষতিপূরণ করা ফরয। ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, নিজের জীবনের সমীক্ষা নিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করবে যে, আমার দায়িত্বে কী পরিমাণ নামায আছে। সঠিকভাবে হিসাব করা সম্ভব হলে সঠিকভাবে হিসাব করবে। কিন্তু যদি সঠিকভাবে হিসাব লাগানো সম্ভব না হয়, তাহলে সতর্কতার খাতিরে কিছুটা বেশি হিসাব করবে। কম যেন না হয়। এরপর একটা খাতা বা ডায়েরীতে লিখবে যে, আজ এই তারিখে আমার দায়িত্বে এত এত নামায ফরয। আর আজ থেকে আমি সেটা আদায় করা আরম্ভ করছি। আমার জীবদ্দশায় যদি আমি এ নামাযগুলো আদায় করতে না পারি, তাহলে আমি অসিয়্যত করছি যেন আমার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে এসব নামাযের ফিদইয়া আদায় করে দেয়া হয়।

একটি অসিয়্যতনামা লিখবে

এই অসিয়্যত লেখা এ জন্য জরুরী যে, যদি আপনি এ অসিয়্যত না লিখেন আর কাযা নামায আদায় করার পূর্বে আপনার ইন্তিকাল হয়ে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনার নামাযের ফিদইয়া আদায় করা ওয়ারিসদের দায়িত্বে শরীয়তগতভাবে জরুরী হবে না। বরং এটা তাদের মর্জির উপর নির্ভরশীল থাকবে। চাইলে দিতেও পারে। আবার চাইলে নাও দিতে পারে। ফিদইয়া আদায় করে দিলে তাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ হবে।

কিন্তু যদি আপনি ফিদইয়া আদায় করার অসিয়্যত করে দেন, তাহলে এ ক্ষেত্রে ওয়ারিসগণ শরীয়তমতে এ কথার পাবন্দ হবে যে, সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ঐ অসিয়্যত কার্যকর করতে পারবে। এবং নামাযের ফিদইয়া আদায় করতে পারবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে, আর তার নিকট অসিয়ত লেখার মত কোন বিষয় থাকে, তাহলে তার জন্য অসিয়্যত লেখা ব্যতীত দুই রাত কাটানোও জায়িয নেই।" (জামে তিরমিযী ২: ৩৩)

অতএব কারো দায়িত্বে নামায কাযা থাকলে উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে তার জন্য অসিয়্যত লেখা জরূরী।

এখন আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত যে, আমাদের মধ্যে কয়জন স্বীয় অসিয়্যতনামা লিখে রেখেছেন। অথচ অসিয়্যতনামা না লেখা একটি স্বতন্ত্র গুনাহ। যতক্ষণ পর্যন্ত অসিয়্যতনামা না লিখবে, অতক্ষণ পর্যন্ত এ গুনাহ হতে থাকবে। এজন্য আজকেই আমাদের অসিয়্যতনামা লেখা উচিত।

"উমরী কাযা" আদায়

এরপর এ সব কাযা নামায আদায় করা আরম্ভ করে দিবে। এটাকে "উমরী কাযা"ও বলা হয়।

এটার পদ্ধতি হল এই যে, প্রত্যেক ওয়াক্তী নামাযের সাথে একটি কাযা নামাযও পড়বে। আর যদি কারো সময় বেশি থাকে, তাহলে একাধিক ওয়াক্তের কাযাও আদায় করতে পারে। যত দ্রুত এ নামাযগুলো পূর্ণ হবে ততই মঙ্গল। বরং ওয়াক্তী নামাযগুলোর সাথে যে সব নফল নামায থাকে, সেগুলোর পরিবর্তে কাযা নামায আদায় করবে। আর ফজর ও আসরের পর যদিও নফল নামায জায়িয নেই, কিন্তু কাযা নামায পড়া জায়িয আছে। আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে এতটুকু আসানী করেছেন। আমাদের উচিত এই আসানীর দ্বারা ফায়েদা উঠানো। আর যে পরিমাণ নামায আদায় হবে, সেটা ঐ খাতায় সাথে সাথে লিখে রাখবে যে, এ পরিমাণ আদায় হয়েছে আর এ পরিমাণ অবশিষ্ট আছে।

সুন্নাতের পরিবর্তে কাযা নামায পড়া বৈধ নয়

অনেকে এ মাসআলা জিজ্ঞেস করে যে, যেহেতু আমাদের দায়িত্বে প্রচুর কাযা নামায আছে, তাই আমরা কি সুন্নাত আদায়ের পরিবর্তে কাযা পড়তে পারি? যাতে করে কাযা নামায দ্রুত পুরো হয়ে যায়! এর উত্তর হল: সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আদায় করতেই হবে। এগুলো পরিত্যাগ করা জায়িয নেই। অবশ্য নফলের পরিবর্তে কাযা নামায পড়া জায়িয আছে।

কাযা রোযাসমূহের হিসাব এবং অসিয়্যত

এমনিভাবে রোযাসমূহের হিসাব কিতাব নিবে। যখন থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, ঐ সময় থেকে এখন পর্যন্ত কোন রোযা ছুটেছে কিনা? যদি না ছুটে, তাহলে তো খুব ভাল। কিন্তু যদি ছুটে গিয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো হিসাব করে নিজের কাছে অসিয়্যতনামার খাতায় লিখে নিবে যে, আজ অমুক তারিখে আমার দায়িত্বে এ পরিমাণ রোযা বাকী আছে। আমি সেগুলো আদায় করা আরম্ভ করছি। আমার জীবদ্দশায় যদি আমি এগুলো আদায় করতে না পারি, তাহলে

আমার মৃত্যুর পর আমার ত্যায্য সম্পদ থেকে এ রোযাগুলোর ফিদইয়া আদায় করা হবে।

অতঃপর যত রোযা আদায় করবে, ঐ অসিয়্যতনামার খাতায় লিখতে থাকবে যে, এ পরিমাণ রোযা আদায় হয়েছে, আর এ পরিমাণ বাকী আছে। যাতে করে হিসাব পরিষ্কার থাকে।

ওয়াজিব যাকাতের হিসাব এবং অসিয়্যত

এমনিভাবে যাকাতের সমীক্ষা নিবে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যাকাত আদায় করা ফরয হয়ে যায়। অতএব প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি নিজ মালিকানায় যাকাতযোগ্য কিছু থেকে থাকে, আর সেগুলোর যাকাত আদায় করে না থাকে, তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত যত বছর অতিবাহিত হয়েছে, প্রত্যেক বছরের পৃথক পৃথক যাকাত বের করবে। এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুরোপুরি হিসাব কিতাব করে যাকাত আদায় করবে। আর যদি মনে না থাকে, তাহলে সতর্কতার সাথে আন্দায করবে। যাতে বেশি হলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু কম যেন না হয়। অতঃপর সেটা আদায় করার চিন্তা করবে। আর এটাকে স্বীয় অসিয়্যতনামার খাতায় লিখে নিবে। যে পরিমাণ যাকাত আদায় হয়েছে, সেটা খাতায় লিখতে থাকবে। যত দ্রুত সম্ভব আদায় করার ফিকির করবে।

এমনিভাবে হজ্জ জীবনে একবার ফরয হয়। যদি হজ্ব ফরয হয়ে থাকে আর এখনো পর্যন্ত আদায় করে না থাকে, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব এর থেকেও দায়িত্বমুক্ত হওয়ার চিন্তা করবে।

এসব হল হুকূকুল্লাহ বা আল্লাহর হকসমূহ। এগুলো আদায় করাও "তাফসীলী তাওবা"র অংশ।

বান্দার হকসমূহ আদায় করবে অথবা মাফ করাবে

এরপর 'হুকূকুল ইবাদ' বা বান্দার হকসমূহের সমীক্ষা নিবে। যদি কারো জান বা মালের কোন হক নিজ দায়িত্বে থাকে, যেটাকে এখনো

পর্যন্ত আদায় করা হয়নি, তাহলে সেটাকে আদায় করবে অথবা মাফ করাবে অথবা কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে মাফ চেয়ে নিবে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর মজমায় দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করেন যে, "যদি আমি কাউকে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি, অথবা আমার যিম্মায় যদি কারো কোন হক থাকে, তাহলে আজ আমি তোমাদের সকলের সামনে দণ্ডায়মান, সে এসে যেন আমার থেকে বদলা নিয়ে নেয় অথবা মাফ করে দেয়"।

সুতরাং যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, সেখানে আমার আপনার কী অবস্থা? কাজেই এই জীবনে যত মানুষের সাথে সম্পর্ক হয়েছে অথবা লেনদেন হয়েছে অথবা উঠা বসা হয়েছে অথবা আত্মীয় স্বজন, তাদের সাথে যোগাযোগ করে মৌখিকভাবে বা চিঠি লিখে তাদের থেকে জেনে নিবে। আর আপনার দায়িত্বে তাদের কোন অর্থনৈতিক হক থাকলে সেটা আদায় করে দিবেন। অবশ্য যদি মালের হক না থাকে বরং জানের হক থাকে, উদাহরণস্বরূপ কারো গীবত করেছিল, কাউকে মন্দ বলেছিল বা কারো মনে কষ্ট দিয়েছিল, তাহলে এদের সকলের নিকট মাফ চাওয়া জরুরী।

অপর এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "যদি কেউ কারো উপর যুল্ম করে চাই জানের সাথে সম্পৃক্ত যুল্ম হোক অথবা মালের সাথে। আজকেই যেন সে মাফ চেয়ে নেয় অথবা স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে ঐ দিন আসার পূর্বে হিসাব পরিষ্কার করে নিবে যেদিন রৌপ্যমুদ্রাও হবে না। স্বর্ণমুদ্রাও হবে না। কোন সোনা রুপা কাজে আসবে না।"

আখেরাতের ফিকিরওয়ালাদের অবস্থা

যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা আখেরাতের ফিকির দান করেন, তাঁরা জনে জনে গিয়ে তাদের হকসমূহ আদায় করেন। অথবা তাদের থেকে হকসমূহ মাফ করিয়ে নেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. এই সুন্নাতের উপর আমল করত: "العذر والنذر" নামে একটি পুস্তিকা লিখে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত সকলের নামে পাঠালেন।

যার মধ্যে হযরত এ কথা লিখেছিলেন যে, "যেহেতু আপনারা সকলে আমার সাথে সম্পৃক্ত মানুষ, আল্লাহ জানেন কোন্ সময়ে আমার দ্বারা কী ভুলভ্রান্তি হয়ে গেছে অথবা জানিনা আমার যিম্মায় কারো কোন ওয়াজিব হক রয়ে গেছে কিনা। আল্লাহর ওয়াস্তে আজ আমার থেকে ঐ হক উসূল করে নিন অথবা মাফ করে দিন"।

এমনিভাবে আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেবও রহ. তাঁর সাথে সম্পর্কিত সকলের নামে "কুছ তালাফিয়ে মা ফাত" বা "বিগত দিনের কিছু ক্ষতিপূরণ" নামে একটি চিঠি লিখে প্রেরণ করেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের এই পবিত্র অভ্যাস ছিল। এ জন্য সকলের উচিত এ ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া।

এইসব কথা "তাফসীলী তাওবা"র অংশ।

বান্দার হক দায়িত্বে থেকে গেলে কী করবে?

এ কথা তো স্বস্থানে সঠিক যে, "হুকূকুল্লাহ" বা আল্লাহর হকসমূহ তাওবার দ্বারা মাফ হয়ে যায়। কিন্তু "হুকূকুল ইবাদ" বা বান্দার হকসমূহ ঐ সময় পর্যন্ত মাফ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত হকওয়ালা মাফ না করবে। অথবা সেটাকে আদায় না করবে।

কিন্তু হযরত থানভী রহ. বলেন : কারো দ্বারা যদি জীবদ্দশায় বান্দার হক নষ্ট হয়। আর পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ঐ সব হক আদায় করার ফিকির দান করেন এবং তাওবার তাওফীক দান করেন, যদ্দরূন তিনি ঐ সমস্ত হক আদায় করার ফিকির আরম্ভ করলেন এবং লোকদের থেকে খোঁজ খবর নেয়া আরম্ভ করলেন যে,

আমার যিম্মায় কার কী হক বাকী আছে? যাতে করে আমি সেগুলো আদায় করতে পারি কিন্তু এখনো ঐ হকগুলো পুরোপুরি আদায় করে সারতে পারেননি, তার পূর্বেই তার ইন্তিকাল হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হল এই যে, যেহেতু তিনি সমস্ত হক আদায় করে যেতে পারেননি, তাহলে কি আখেরাতের আযাব থেকে তার নাজাত বা পরিত্রাণের কোনই পথ নেই?

হযরত থানভী রহ. বলেন : এমন ব্যক্তিরও হতাশ হওয়া অনুচিত। কেননা যখন সে হক আদায় ও তাওবার পথে চলা আরম্ভ করে দিয়েছে এবং চেষ্টাও শুরু করে দিয়েছে, তো ইনশাআল্লাহ এই প্রচেষ্টার বরকতে আখেরাতে আল্লাহ তাআলা তার হকদার ও পাওনাদারদেরকে খুশী করে দিবেন। আর ঐ হকদাররা স্বীয় হক মাফ করে দিবে।

আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের অত্যাশ্চর্য ঘটনা

প্রমাণ হিসেবে হযরত থানভী রহ. হাদীস শরীফে বর্ণিত ঐ প্রসিদ্ধ ঘটনা পেশ করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। এরপর তার তাওবার চিন্তা শুরু হল। এখন চিন্তা করল যে, আমি কী করব? ফলে সে এক খ্রীষ্টান পাদ্রীর কাছে গেল এবং তাকে গিয়ে বলল যে, "আমি নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছি, আমার জন্য কি তাওবা বা নাজাতের কোন পথ খোলা আছে"? ঐ পাদ্রী উত্তরে বলল যে, "তুমি তো ধ্বংস হয়ে গেছ। এখন তোমার ধ্বংস অনিবার্য। এতে কোনই সন্দেহ নেই। তোমার নাজাত বা মুক্তির কোন পথ নেই"।

এই উত্তর শুনে ঐ ব্যক্তি হতাশ হয়ে গেল। সে চিন্তা করল যে, নিরানব্বইজনকে হত্যা করেছি একজন আর এমন কি! ফলে সে ঐ পাদ্রীকেও হত্যা করল এবং শতক পূর্ণ করল। কিন্তু অন্তরে যেহেতু তাওবার ফিকির লেগে ছিল, এজন্য পুনরায় কোন আল্লাহওয়ালার অনুসন্ধানে বের হল। অনুসন্ধান করতে করতে সে একজন আল্লাহওয়ালা কে পেয়ে গেল। তাঁকে সে নিজের পুরো বৃত্তান্ত শুনাল। তিনি বললেন যে, "এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তুমি এখন

তাওবা কর। আর এই এলাকা ছেড়ে ঐ এলাকায় চলে যাও, কারণ সেটা হল ভাল মানুষদের এলাকা, তাঁদের সাহচর্য অবলম্বন কর"। যেহেতু সে তাওবা করার ক্ষেত্রে মুখলিস ছিল, এজন্য সে ঐ এলাকার উদ্দেশে রওয়ানা হল। এখনো পথেই ছিল যে, তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল।

বর্ণনায় এসেছে যে, এই ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময়ও বুকের উপর ভর করে ঐ এলাকার নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করছিল যে এলাকার উদ্দেশে সে রওয়ানা করেছিল। পরিশেষে তার প্রাণ বের হয়ে গেল। এখন তার রূহ নেয়ার জন্য রহমতের ফেরেশতাগণ এবং আযাবের ফেরেশতাগণ উভয় দল পৌঁছে গেল। উভয় দলের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ হল। রহমতের ফেরেশতাগণ বলতে লাগলেন যে, যেহেতু এ ব্যক্তি তাওবা করে ভালো মানুষদের এলাকার দিকে যাচ্ছিল, সুতরাং তার রূহ আমরা নিয়ে নিব। আর আযাবের ফেরেশতাগণ বলতে লাগলেন যে, সে একশত মানুষকে হত্যা করেছে। আর এখনো পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হয়নি। সুতরাং তার রূহ আমরা নিয়ে যাব। অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ সিদ্ধান্ত দিলেন যে, আচ্ছা দেখা হোক সে কোন্ এলাকার অধিক নিকটবর্তী? যে এলাকা থেকে রওয়ানা হয়েছিল ঐ এলাকার বেশি নিকটবর্তী না যে এলাকার দিকে যাচ্ছিল সে এলাকার বেশি নিকটবর্তী? এখন উভয় দিকের দূরত্ব মাপা হল, তো জানা গেল যে, যে এলাকার দিকে যাচ্ছিল তার সামান্য নিকটবর্তী। ফলে রহমতের ফেরেশতাবৃন্দ তার রূহ নিয়ে গেল। এই প্রচেষ্টার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিলেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, হাদীস নং ২৭৬৬)

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. বলেন : যদিও তার যিম্মায় হুকূকুল ইবাদ ছিল, কিন্তু যেহেতু নিজের উদ্যোগে চেষ্টা শুরু করেছিল এজন্য আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিয়েছেন।

এমনিভাবে যদি কারো যিম্মায় 'হুকূকুল ইবাদ' থাকে, আর সে সেগুলো আদায় করার চেষ্টা আরম্ভ করে এবং এ ফিকিরে লেগে যায়,

এমতাবস্থায় মৃত্যু চলে আসে, তাহলে মহান আল্লাহর রহমতের কাছে এটাই আশা ও প্রত্যাশা যে, তিনি হকদারদেরকে কিয়ামতের দিন রাযী খুশী করে দিবেন।

যাইহোক এ দুই প্রকারের তাওবা করুন। একটি এজমালী বা সংক্ষিপ্ত তাওবা, আর অপরটি তাফসীলী বা বিস্তারিত তাওবা।

আল্লাহ তাআলা নিজ রহমতে আমাদের সকলকে এর তাউফীক দান করুন। আমীন।

অতীত গুনাহ ভুলে যান

আমাদের হযরত ডাঃ আব্দুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন : যখন তোমরা এ উভয় প্রকারের তাওবা করে নিবে, এরপরে অতীতের গুনাহের কথা মনেও করবে না। বরং সেগুলো ভুলে যাও। কেননা যে গুনাহ থেকে তাওবা করেছ সেটা কে স্মরণ করা একদিকে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের অবমূল্যায়ন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এ ওয়াদা করেছেন যে, যখন তোমরা ইসতিগফার করবে এবং তাওবা করবে, তখন আমি তোমাদের তাওবা কবূল করব এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিব, শুধু তাই নয় আমলনামা থেকে মিটিয়ে দিব।

এখন যেহেতু আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, এরপরও যদি অতীত গুনাহগুলো স্মরণ করে সেটার ওযীফা পড়তে থাকো, তবে সেটা হবে তাঁর রহমতের অবমূল্যায়ন। কেননা এগুলোর স্মরণ অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। এজন্য এগুলো মনে আনবে না। বরং ভুলে যাও।

গুনাহ মনে আসলে ইসতিগফার করুন

মুহাক্কিক ও গাইরে মুহাক্কিকের মধ্যে এটাই পার্থক্য। গাইরে মুহাক্কিক ব্যক্তি অনেক সময় উল্টো কাজ বলে দেয়।

আমার জনৈক বন্ধু খুব ভাল মানুষ ছিলেন। সব সময় রোযা রাখতেন। তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন। একজন পীর সাহেবের সাথে তার

সম্পর্ক ছিল। তিনি বলতেন : আমার পীর সাহেব আমাকে বলেছেন : "রাত্রে যখন তুমি তাহাজ্জুদের জন্য উঠবে, তখন তাহাজ্জুদ পড়ার পর নিজের পিছনের সমস্ত গুনাহ স্মরণ কর। আর সেগুলো স্মণ করে খুব কান্নাকাটি কর"!!

কিন্তু আমাদের হযরত ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব রহ. বলতেন : "এ পদ্ধতি সঠিক নয়। কেননা তাওবা করার পর আল্লাহ্ তাআলা আমাদের পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাদের আমলনামা থেকে মিটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তুমি সেগুলো স্মরণ করে কেমন যেন প্রকাশ করতে চাচ্ছ যে, এখনো আল্লাহ তাআলা গুনাহ মিটিয়ে দেননি। আর আমি তো সেগুলো মিটতে দিব না বরং সেগুলো স্মরণ করব!!

তো এ কর্মপন্থায় আল্লাহ্ তাআলার শানে রহমতের নাকদরী (অবমূল্যায়ন) ও নাশোকরী (অকৃতজ্ঞতা) হচ্ছে। কেননা যখন তিনি তোমার আমলনামা থেকে সেগুলো মিটিয়ে দিয়েছেন, এখন সেগুলো ভুলে যাও। সেগুলো মনে করো না, আর যদি কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে ঐসব গুনাহের খেয়াল চলে আসে, তাহলে ঐ সময় ইসতিগফার পাঠ করে এই খেয়ালকে খতম করে দাও"।

বর্তমান অবস্থার সংশোধন করুন

আমাদের হযরত ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব রহ. কত সুন্দর কথা বলেছেন : যা স্মরণ রাখার যোগ্য। হযরত বলেন : "যখন তোমরা তাওবা করে ফেলেছো, এখন অতীতের ফিকির ছেড়ে দাও। কেননা যখন তাওবা করেছো, তখন এই আশা রাখো যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে কবূল করবেন ইনশাআল্লাহ। আর ভবিষ্যতের চিন্তাও ছেড়ে দাও যে, ভবিষ্যতে কী হবে? কী হবে না। বর্তমান হালত যা অতিবাহিত হচ্ছে সেটার ফিকির করো যেন তা সংশোধিত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যে কাটে আর এর মধ্যে কোন গুনাহ্ প্রকাশ না পায়"।

বর্তমানে আমাদের অবস্থা হল, হয়ত আমরা অতীতে পড়ে থাকি যে, আমার দ্বারা এত এত গুনাহ সংঘটিত হয়েছে, এখন আমার অবস্থা কী হবে? কিভাবে আমার মার্জনা হবে? এর পরিণতিতে নৈরাশ্য সৃষ্টি হয়ে বর্তমানও খারাপ হয়ে যায়।

অথবা আমরা ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর থাকি যে, এ মুহূর্তে তাওবা করলেও আগামীতে কিভাবে গুনাহ থেকে বাঁচব?

আরে এটা চিন্তা করো যে, যখন আগামী সময় আসবে, তখন দেখা যাবে। এখন বর্তমানকালের ফিকির করো, যা অতিবাহিত হচ্ছে। কেননা এই বর্তমানই অতীত হয়ে যাচ্ছে। আর প্রত্যেক ভবিষ্যত বর্তমান হবে।

এজন্য ব্যস, বর্তমান অবস্থার সংশোধনের ফিকির করো। অতীত স্মরণ করে হতাশায় ভুগবে না।

বাস্তবিকপক্ষে শয়তান আমাদেরকে এভাবে প্ররোচনা দেয় যে, "তুমি তোমার অতীত দেখ। কত বড় বড় গুনাহ তুমি করেছ! আর তুমি তোমার ভবিষ্যতকে দেখ যে, ভবিষ্যতে তোমার দ্বারা কী হবে"?

এভাবে অতীত-ভবিষ্যতের গোলকধাঁধায় ফেলে শয়তান আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। এজন্য শয়তানের ধোঁকায় পড়বে না। বর্তমান অবস্থা সংশোধনে মনোযোগী হও।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ ফিকির দান করুন। আমীন।

"খাইরুল কুরূন" বা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবূ কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا لَعَنَ إِبْلِيْسَ سَئَلَهُ النَّظْرَةَ فَأَنْظَرَهُ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا أَخْرُجُ مِنْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ مَادَامَ فِيْهِ الرُّوْحُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَعِزَّتِيْ لَا أَحْجِبُ عَنْهُ التَّوْبَةَ مَا دَامَ الرُّوْحُ فِي الْجَسَدِ.

অর্থাৎ "আল্লাহ তাআলা যখন ইবলীসকে নিজ দরবার থেকে বিতাড়িত করলেন, তখন ইবলীস আল্লাহর নিকট অবকাশ কামনা করল। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা তাকে কেয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করলেন। এরপর ইবলীস বলল : "আপনার ইযযতের কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আদম সন্তানের মধ্যে রূহ আছে অতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কলব থেকে বের হব না।" তখন আল্লাহ তাআলা বললেন : "আমার ইযযতের কসম! আমি আদম সন্তানের জন্য তাওবার দরওয়াযাও ঐ সময় পর্যন্ত বন্ধ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরে রূহ অবশিষ্ট আছে।"

(কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারককৃত, খণ্ড ১, পৃ. ৩৬৯, হাদীস নং ১০৪৫)

হযরত আবূ কিলাবা রহ. শীর্ষস্থানীয় তাবেঈদের একজন। কেউ মুসলমান অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তাঁকে "সাহাবী" বলা হয়। আর যিনি মুসলমান অবস্থায় কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে "তাবেয়ী" বলে। আর যদি কেউ মুসলমান অবস্থায় কোন তাবেয়ীর সাথে সাক্ষাৎ করেন তবে তাঁকে "তাবে তাবেয়ী" বলা হয়।

এ তিনটি যুগ। যাকে রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম خير القرون যা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই তো তিনি ইরশাদ করেছেন :

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

অর্থাৎ "সব থেকে শ্রেষ্ঠ হল আমার যুগের মানুষ। এরপর তাঁরা যাঁরা তাঁদের সাথে লাগোয়া। এরপর তাঁরা যাঁরা তাঁদের সাথে লাগোয়া।

(সহীহ বুখারী, বাবু ফাযায়িলে আসহাবিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদীস নং ২৪৫৮)

এজন্য হাযারাতে সাহাবায়ে কিরামের রাযি. সোহবতের বরকতে আল্লাহ তাবেয়ীদেরকেও অনেক উঁচু মর্যাদা দান করেছেন।

হযরত আবূ কিলাবাও রহ. তাবেয়ীদের মধ্যে একজন। তিনি সরাসরি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। কিন্তু বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের রাযি. সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এবং বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস রাযি.-এর অন্যতম শিষ্য।

তাবেয়ীদের সতর্কতা ও ভয়

এই হাদীস যেটা হযরত আবূ কিলাবা রহ. বর্ণনা করেছেন। যদিও নিজ কথা হিসেবে বয়ান করেছেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটা হাদীস। কেননা তিনি নিজের পক্ষ থেকে, নিজ বিবেকের দ্বারা এমন কথা বলতে পারেন না। তিনি নিজের উক্তি হিসেবে এজন্য বর্ণনা করেছেন কারণ হাযারাতে তাবেয়ীন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে কোন কিছুর সম্বন্ধ করতে ভয় পেতেন। কেননা হতে পারে যে, কোথাও কোন কথা সম্বন্ধ করার ক্ষেত্রে একটু এদিক সেদিক হয়ে যেতে পারে, যদ্দরূন পাকড়াও এর আশংকা যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ভুল কথার নিসবত বা সম্বন্ধ করেছ। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে এবং আমার দিকে এমন কথার সম্বন্ধ করবে যা আমি বলিনি, তাহলে তার উচিত নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়া।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ১০৭)

এত শক্ত কথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এজন্য সাহাবায়ে কিরাম রাযি.ও তাবেয়ীনে ইযাম রহ. হাদীস বর্ণনা করার সময় কাঁপতে থাকতেন।

হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত

একজন তাবেয়ী একজন সাহাবীর ব্যাপারে বর্ণনা করছেন যে, যখন ঐ সাহাবী আমাদের সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। আবার অনেক সময় তাঁর শরীরে কম্পন আরম্ভ হয়ে যেত যে, কোন কথায় কোন ভুল যেন হয়ে না যায়।

এমনকি কোন কোন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করার পর বলতেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের বা এ জাতীয় বা এ প্রকারের কথা বলেছেন। হতে পারে আমি বর্ণনা করার সময় কিছু হেরফের হয়ে গেছে!

এসব কিছু এ জন্য করতেন যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে কোন ভুল কথা সম্বন্ধ করার গুনাহ না হয়।

এর দ্বারা আমরা এ শিক্ষা পাই যে, আমরা অনেক সময় তাহকীক ব্যতীত, সতর্কতা ছাড়াই হাদীস বর্ণনা করা আরম্ভ করে দেই। কোন স্থান হতে একটি কথা শুনলাম আর সঙ্গে সঙ্গে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করে দিলাম!

অথচ দেখুন সাহাবায়ে কিরাম রাযি. যাঁরা সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শুনেছেন তাঁরা কী পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন! অথচ আমরা এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করি না। এজন্য হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সব সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক শব্দ জানা না থাকবে, অতক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করা অনুচিত।

এ হাদীসের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন। হযরত আবূ কিলাবা রহ. এটা বলছেন না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেন। বরং এটাকে নিজের কথা হিসেবে বলছেন। অথচ বাস্তবিকপক্ষে এটা হাদীস।

যাইহোক তিনি বলছেন যে, যখন আল্লাহ তাআলা ইবলীসকে বিতাড়িত করলেন। প্রত্যেক মুসলমান ঘটনা জানেন। ইবলীসকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন সে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করে। সে অস্বীকার করে বলল : "আমি তো সেজদা করব না।"

এই অস্বীকৃতির দরুন আল্লাহ তাআলা তাকে নিজ দরবার থেকে বিতাড়িত করলেন।

ইবলীসের কথা সত্য ছিল, কিন্তু...

এখানে একটি কথা বুঝে নিন। যদি চিন্তা করা হয় তাহলে বাহ্যিকভাবে ইবলীস যে কথা বলছিল সেটা কোন খারাপ কথা ছিল না। কেননা যদি সে বলত যে, এই কপাল তো আপনার জন্য নির্দিষ্ট। এই কপাল তো শুধু আপনার সামনে ঝুঁকতে পারে। অন্য কারো সামনে ঝুঁকতে পারে না। এই মাটির দেহ যাকে আপনি নিজের কুদরতী হাত দ্বারা বানিয়েছেন এটাকে আমি কেন সেজদা করব? আমার সেজদা তো আপনার জন্য।

তো বাহ্যিকভাবে এ কথাটা ভুল ছিল না। কিন্তু এ কথাটা ভুল এ জন্য হয়েছে, যেহেতু যে মহান সত্তাকে সেজদা করতে হয়, যখন ঐ সত্তা নিজেই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, মাটির ঐ অবয়বটাকে সেজদা কর, তো এখন কোন যুক্তির পিছনে পড়ার সুযোগই নেই। এই নির্দেশের পর স্বীয় যুক্তির ঘোড়া দৌড়ানোর কোন অবকাশই নেই যে, এই মাটির দেহ সেজদা করার যোগ্য নাকি অযোগ্য?

দেখুন! বাস্তবিকপক্ষে মানুষ সেজদার উপযুক্ত তো ছিল না। তাই তো যখন শেষ নবীর শেষ উম্মত এ দুনিয়াতে আসল, তখন চিরকালের জন্য এই নির্দেশ দিয়ে দেয়া হল যে, এখন কোন মানুষকে সেজদা করা জায়িয নেই, বুঝা গেল যে, মূল নির্দেশ এটাই ছিল যে, মানুষকে সেজদা করা কোন অবস্থাতেই জায়িয নেই। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, "সেজদা কর", সেখানে যুক্তির

পিছনে পড়ার কোন মানে হয় না। শয়তান প্রথম ভুল এটাই করেছে যে, নিজের আকলের ঘোড়া দৌড়ানো আরম্ভ করে দিয়েছে।

আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ

শয়তান দ্বিতীয় যে ভুলটি করেছে সেটা হল, শয়তান সেজদা না করার কারণ হিসেবে এ কথা বলেনি যে, এ কপাল তো আপনার জন্য। বরং কারণ হিসেবে বলেছে যে, এই আদমকে আপনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন আর আমাকে আপনি আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর আগুন মাটি থেকে উত্তম। এজন্য আমি তাকে সেজদা করতে পারি না!

এর পরিণামে আল্লাহ তাআলা তাকে দরবারে ইলাহী থেকে বিতাড়ন করলেন এবং নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে, এখান থেকে বের হয়ে যাও।

আল্লাহ তাআলার নিকট অবকাশ চেয়ে নিয়েছে

যাইহোক। যখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিতাড়িত করেন তখন সে দরখাস্ত পেশ করে বলে :

اَنۡظِرۡنِیۡۤ اِلٰی یَوۡمِ یُبۡعَثُوۡنَ ﴿۱۴﴾

"হে আল্লাহ! আমাকে পুনরুত্থান দিবস তথা কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিন যেন আমি জীবিত থাকি, আমার মৃত্যু না হয়"। (সূরা আ'রাফ: ১৪)

শয়তান বড় আরেফ ছিল

হযরত থানভী রহ. বলতেন যে, এ ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, "ইবলীস" অনেক বড় আরেফ ছিল। কেননা একদিকে তাকে দরবারে ইলাহী থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে, জান্নাত থেকে বহিস্কার করা হচ্ছে, তার উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হচ্ছে, কিন্তু গযব নাযিল হওয়ার মুহূর্তেও সে আল্লাহর কাছে দু'আ করে অবকাশ চেয়ে নিল। কেননা সে জানত যে, আল্লাহ তাআলা গোস্বা দ্বারা প্রভাবিত হন না।

আর গোস্বার হালতেও তাঁর কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি দিয়ে দেন। ফলে সে অবকাশ চেয়ে নিয়েছে।

আমি মৃত্যু পর্যন্ত বনী আদমকে প্ররোচনা দিতে থাকব

উত্তরে আল্লাহ তাআলা বললেন :

فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝٣٧ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝٣٨

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ের দিন তথা কিয়ামত পর্যন্ত তোকে অবকাশ দেয় হল।" (সূরা হিজর : ৩৭-৩৮)

এই অবকাশ লাভের পর সে আল্লাহ তাআলাকে সম্বোধন করে বলছে: "ইয়া আল্লাহ! আপনার ইযযতের কসম করে বলছি, আমি বনী আদমের অন্তর থেকে ঐ সময় পর্যন্ত বের হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরে রূহ অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ মৃত্যু আসা পর্যন্ত বের হব না। আর এই আদম যাঁর কারণে আমাকে বহিষ্কৃত হতে হল, তাঁর সন্তানদের অন্তরে আমি নানা প্রকারের কুচিন্তা দিতেই থাকব, প্ররোচনা দিয়েই যাব। গুনাহের তীব্র ইচ্ছা, সেটার উপলক্ষসমূহ, তাদের অন্তরে সৃষ্টি করতে থাকব। আর তাদেরকে আমি পাপের প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জীবিত আছে"।

আমি মৃত্যু পর্যন্ত তাওবা কবূল করতে থাকব

শয়তানের কথার উত্তরে আল্লাহ তাআলাও নিজ ইযযতের কসম করে বলেছেন : "আমার ইযযতের কসম! আমি ঐ বনী আদমের জন্য তাওবার দরওয়াযাও ঐ সময় পর্যন্ত বন্ধ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরে রূহ অবশিষ্ট আছে। তুই আমার ইযযতের কসম করে বলেছিস যে, তুই বের হবি না। আমি আমার ইযযতের কসম করে বলছি : আমি তাদের জন্য তাওবার দরওয়াযা বন্ধ করব না। তুই যদি হয়ে থাকিস বিষ, তাহলে আমি আদমের প্রত্যেক সন্তানকে দান করলাম ঐ বিষের প্রতিষেধক, সেটাই হল "তাওবা"। যা আমি তাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছি। যখন বনী আদম গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করবে,

তখন আমি তোর সমস্ত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত, সকল কূটকৌশল ঐ তাওবার ফলে এক মুহূর্তে খতম করে দিব"।

কেমন যেন আল্লাহ তাআলা বনী আদমের জন্য নিজ রহমতের সাধারণ ঘোষণা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, হে আদম সন্তান! তুমি এটা মনে কর না যে, আমি অতিপ্রাকৃতিক কোন শক্তি শয়তানের আকৃতিতে তোমার উপর চাপিয়ে দিয়েছি, যার থেকে তুমি মুক্তি পাবে না।

শয়তান একটি পরীক্ষা

আসল ব্যাপার হল, আমি শয়তানকে শুধুমাত্র তোমাদের সামান্য পরীক্ষা নেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমিই তাকে বানিয়েছি। আমিই তাকে প্ররোচনা প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছি। কিন্তু এমন কোন শক্তি তাকে দেইনি যেটাকে তোমরা পদানত করতে পারবে না।

কুরআনে হাকীমে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন :

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ۝

অর্থাৎ "শয়তানের কূটচাল নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্বল।"

(সূরা নিসা : ৭৬)

বুঝা গেল যে, শয়তানের কূটচাল এতই দুর্বল যে, যদি কোন মানুষ ঐ শয়তানের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর বলে যে, "হে শয়তান! আমি তোর কথা মানব না। তুই আমাকে যে গুনাহে লিপ্ত করতে চাস আমি ঐ গুনাহ করব না।" তো শয়তান তখনই গলে যায়। এই শয়তান হল শক্তের ভক্ত, নরমের যম। সে দুর্বল ও কম সাহসী মানুষের উপর বাঘ হয়ে যায়। যাদের মধ্যে গুনাহ বর্জনের কোন ইচ্ছাই নেই।

কিন্তু তারপরও যদি শয়তানের কৌশল সফল হয়। আর কোন হিম্মতহারা মানুষ তার কথা মেনে নেয়, তাহলে ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। কেননা আমি (মহান আল্লাহ) তাওবার প্রতিষেধক সৃষ্টি

করেছি। আমার কাছে চলে আস। নিজের গুনাহ স্বীকার করে নাও যে, ইয়া আল্লাহ! আমার দ্বারা ভুল হয়ে গেছে। স্বীয় গুনাহের উপর তাওবা কর আর বল :

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ إِلَيْهِ

এর ফলে শয়তানের সমস্ত ক্রিয়া এক মুহূর্তে দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

সর্বোত্তম গুনাহগার হয়ে যাও

এ কারণেই অপর এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

كُلُّكُمْ خَطَّاءٌ, وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ

অর্থাৎ "তোমরা সকলে গুনাহগার, আর সর্বোত্তম গুনাহগার তারাই যারা তাওবা করে।" (তিরমিযী শরীফ)

আরবী ভাষায় "خَطَّاءٌ" ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে অনেক বেশি ভুল করে। আর যে সামান্য ভুল করে তাকে "خَاطِئٌ" বলা হয়।

এ হাদীসে পাকের দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের দ্বারা গুনাহও হবে, গুনাহের চাহিদাও সৃষ্টি হবে। কিন্তু সেখানে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা কর। তাড়াতাড়ি অস্ত্র সমর্পণ করবে না। আর যদি কখনো গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে হতাশ হওয়ার পরিবর্তে আমার কাছে ফিরে আস, তাওবা কর। এখানেও "تَوَّابٌ" শব্দের অর্থ হল 'অধিক তাওবাকারী'।

বুঝে আসল যে, স্রেফ একবার তাওবা করা যথেষ্ট নয়। বরং প্রত্যেকবার যখনই গুনাহ হবে, তখনই তাওবা করবে। আর যখন বেশি বেশি তাওবা করবে, তখন শয়তানের কোন কৌশল কাজে আসবে না, আর তুমি শয়তান থেকে হেফাযতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলার রহমতের একশত অংশ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهٗ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ.

অর্থাৎ "হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা যে "রহমত" সৃষ্টি করেছেন তার একশত ভাগ। এই একশত ভাগের মাত্র এক ভাগ রহমত দুনিয়াতে নাযিল করেছেন। যদ্দরুন মানুষ পরস্পরে একে অপরকে মহব্বত করে। যেমন পিতা মাতা সন্তানকে স্নেহ করেন। ভাই ভাইকে আদর করে। বোনকে মায়া করে। অথবা এক বন্ধু অপর বন্ধুকে ভালোবাসে। কেমন যেন পৃথিবীতে পারস্পরিক যত মহব্বত ও ভালোবাসা, সেটা ঐ একশ ভাগের এক ভাগের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া। যা আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এমনকি ঘোড়ীর বাচ্চা যখন দুধ পান করার জন্য আসে, তখন ঘোড়ী স্বীয় পা উঠিয়ে নেয়। যাতে এমন না হয় যে, দুধ পান করার সময় এ পা বাচ্চার গায়ে লেগে গেল"।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবা)

তো এটাও ঐ একশ ভাগের একটা অংশমাত্র। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ রহমত মহান আল্লাহ নিজের কাছে সংরক্ষিত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আখেরাতে নিজ বান্দাদের উপর রহমতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন।

ঐ দয়ালু সত্তা থেকে কিভাবে হতাশ হতে পারে?

এ হাদীসের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এটা জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা কি ঐ সত্তার রহমত

থেকে হতাশ, যে সত্তা তোমাদের জন্য আখেরাতে সমস্ত রহমত একত্রিত করে রেখেছেন। ঐ সত্তা থেকে হতাশা প্রকাশ করো? তিনি কি স্বীয় রহমত থেকে তোমাদেরকে দূর করে দিবেন?

অবশ্য কথা শুধু এতটুকু যে, ঐ রহমত নিজের দিকে নিবদ্ধ করতে যতটুকু বিলম্ব মাত্র। আর ঐ রহমত নিজের দিকে নিবদ্ধ করার পদ্ধতি হল এই যে, সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করো। ইসতিগফার করো। গুনাহসমূহ ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করো। যত বেশি রুজু করবে, তাওবা ইসতিগফার করবে, ততই মহান আল্লাহর রহমত তোমার প্রতি নিবদ্ধ হবে। আর আখিরাতে তুমি বেড়া পার হয়ে যাবে।

শুধু আকাংখা করা যথেষ্ট নয়

কিন্তু এই রহমত শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিকেই উপকার পৌঁছাবে, যে মহান আল্লাহর ঐ রহমত দ্বারা উপকার লাভের প্রত্যাশা রাখে। এখন যদি কেউ এই রহমত দ্বারা উপকার গ্রহণ করতেই না চায় বরং পুরো জীবন উদাসীনতার মধ্যেই কাটিয়ে দেয়, এরপর মহান আল্লাহর কাছে আশা রাখে যে, আল্লাহ তাআলা যেহেতু অত্যন্ত দয়ালু করুণাময়; কাজেই তিনি তো আমাকে মাফ করেই দিবেন!!

এ জাতীয় মানুষদের জন্যই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللهِ

অর্থাৎ "আর বোকা হল ঐ ব্যক্তি যে কুপ্রবৃত্তির পিছনে ছুটে, আর আল্লাহ তাআলার কাছে আশা রাখে যে, তিনি মাফ করে দিবেন"!

(তিরমিযী শরীফ, সিফাতুল কিয়ামাহ, ২৬ নং অধ্যায়)

তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি স্বীয় আমলের দ্বারা মহান আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, আর সে চেষ্টাও অব্যাহত রেখেছে, তাহলে আল্লাহ তাআলার রহমত ইনশাআল্লাহ আখেরাতে তাকে বেষ্টন করে নিবে।

জনৈক ব্যক্তির অদ্ভূত ঘটনা

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. হতে আরেকটি হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী উম্মতের জনৈক ব্যক্তির ঘটনা বয়ান করলেন। যে নিজের উপর অনেক যুলুম করেছিল, বড় বড় গুনাহ করে ছিল। খুব নোংরা জীবন যাপন করেছিল। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তখন সে নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে অসিয়্যত করে বলল যে, আমি পুরো জীবন গুনাহ আর উদাসীনতার মধ্যে কাটিয়েছি। কোন নেক কাজ করতে পারিনি। এজন্য আমি মারা যাওয়ার পর আমার লাশ জ্বালিয়ে দিবে, এরপর যে ছাই থাকবে সেগুলোকে পাউডারের মত পিষে ফেলবে। অতঃপর ঐ গুঁড়া মিহি ছাইগুলোকে বিভিন্ন স্থানে তীব্র বাতাস চলাচলের সময় উড়িয়ে দিবে। যাতে করে সেই ছাই কণাগুলো দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

এই অসিয়্যত আমি এজন্য করছি আল্লাহর কসম, যদি আমি আল্লাহ তাআলার হাতে চলে আসি, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন আযাব দিবেন, যে আযাব তিনি আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কাউকে দেননি। কেননা আমি গুনাহই এমন করেছি যে, আমি এ আযাবের উপযুক্ত।

যখন ঐ ব্যক্তির ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন তার পরিবারের সদস্যরা তার অসিয়্যতের উপর আমল করতঃ তার লাশ জ্বালিয়ে দিল। এরপর ছাইগুলো বাতাসে উড়িয়ে দিল। যদ্দরূন সেগুলোর কণা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল।

আসলে তো ব্যাপারটি ছিল তার নির্বুদ্ধিতা যে, সম্ভবত আল্লাহ তাআলা তার দেহভস্মের কণাগুলো একত্রিত করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বাতাসকে নির্দেশ দিলেন। যেন তার সমস্ত অংশ একত্রিত করা হয়। যখন শরীরের সমস্ত অংশ একত্রিত হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিলেন যে, তাকে পুনরায় পরিপূর্ণ

মানবাকৃতি দেয়া হোক। ফলশ্রুতিতে সে পুনরায় জীবিত হয়ে মহান আল্লাহর সামনে নীত হল।

মহান আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন : "তুমি তোমার ঘরের মানুষদেরকে এসব আমলের অসিয়্যত কেন করেছিলে?" প্রতিউত্তরে ঐ লোকটি বলল : خَشِيْتُكَ يَا رَبِّ "হে প্রভু! আপনার ভয়ে এমনটি করেছি"। কেননা আমি জীবনে অনেক পাপ করেছি। ঐসব পাপের ফলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, আমি আপনার শাস্তির উপযুক্ত। আর আপনার আযাব বড় শক্ত। এজন্য আমি এই আযাবের ভয়ে উক্ত অসিয়্যত করে দিয়েছি।

তখন আল্লাহ তাআলা বললেন : "তুমি আমার আযাবের ভয়ে এই কাজ করেছ। যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।"

ঘটনাটি স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করেছেন। এবং সহীহ মুসলিমে সহীহ সনদে বিদ্যমান।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবা)

এখন একটু চিন্তা করুন। এই মানুষটির উল্লেখিত অসিয়্যতটি কী পরিমাণ নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ছিল! বরং গভীরভাবে দেখা হলে বলতে হয় 'কুফরীসুলভ' ছিল। কেননা সে বলছিল যে, যদি আমি আল্লাহ তাআলার হাতে এসে পড়ি, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাকে আযাব দিবেন। কিন্তু যদি তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে কিংবা ছাই বানিয়ে উড়িয়ে দাও, তাহলে আমি আর আল্লাহর হাতে আসব না। নাউযুবিল্লাহ!

এমন আকীদা পোষণ করা তো কুফর ও শিরক। মনে হয় যেন আল্লাহ তাআলা ছাইয়ের ভস্মগুলো একত্রিত করতে সক্ষম নন!

কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি এ কাজ কেন করেছ? তখন সে উত্তরে বলেছে "হে আল্লাহ! আপনার ভয়ে"।

আল্লাহ তাআলা বলবেন : তুমি তো জানতে ও মানতে যে, আমি তোমার রব। আর এটাও মানতে যে, তুমি আমার অবাধ্যতা করেছ।

আর এই অবাধ্যতার উপর তুমি লজ্জিতও ছিলে এবং তুমি মৃত্যুর পূর্বে নিজ কৃতকর্মসমূহের উপর অনুতাপ প্রকাশ করেছিলে। এজন্য আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি।

এ ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বুঝানো যে, মহান আল্লাহর রহমত বাস্তবিকপক্ষে বান্দাদের থেকে শুধুমাত্র একটা জিনিসই চায়। সেটা হল এই যে, বান্দা নিজ কৃতকর্মসমূহের উপর সাচ্চা দিলে অনুতপ্ত হবে। আর অনুতপ্ত হয়ে ঐ সময় যতটুকু পারে করবে। তাহলে আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবূল করে তাকে মাফ করে দেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক অর্থে আমাদের গুনাহসমূহের উপর লজ্জিত হওয়ার এবং তাওবা করার তাউফীক দান করুন। এবং নিজ রহমতে আমাদের সকলকে মাগফিরাত নসীব করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান ছাহেব কর্তৃক রচিত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহ

১. বড়দের ছেলেবেলা (২৪জন মহামনীষীর শৈশবের বিস্ময়কর কাহিনী)
২. ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
৩. আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
৪. আদর্শ জীবন গঠনের ইসলামী পদ্ধতি (মাওয়ায়েযে আবরার-২)
৫. আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণের পথ (মাওয়ায়েযে আবরার-৩)
৬. আহকামে যাকাত
৭. আহকামে সফর
৮. শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম (?) খোমিনী
৯. বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা
১০. বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ
১১. বিনয়: উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানবৃদ্ধির উপলক্ষ
১২. সহীহ হাদীসের আলোকে নামায
১৩. কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
১৪. বিষয়ভিত্তিক বয়ান (অপ্রকাশিত)
১৫. তোমারই কুদরত দেখতে পাই (কবিতামালা)
১৬. ধূম্রজালে জিহাদ
১৭. ইসলাহী মাজালিস (দ্বিতীয় খণ্ড)
১৮. মাজালিসে আবরার
১৯. রাসায়িলে আবরার
২০. আততাকসীমুস সাবয়ী (আরবী পুস্তিকা)
২১. মনীষীদের ছোটবেলা
২২. মালফূযাতে ফুলপুরী রহ.
২৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নূরের তৈরী?
২৪. মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত রহ.
২৫. এনজিও আগ্রাসন : দেশে দেশে
২৬. মালফূযাতে রায়পুরী রহ.
২৭. ইরশাদাতে আকাবির
২৮. ইরশাদাতে গাঙ্গুহী রহ.
২৯. ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম
৩০. মাজালিসে সিদ্দীক
৩১. তাওবা : গুনাহসমূহের প্রতিষেধক
৩২. আহকামে হজ্ব
৩৩. আহকামে ইতিকাফ
৩৪. কাদিয়ানী ফিতনা ও মুসলিম উম্মাহর অবস্থান
৩৫. চোখ ও যবানের হেফাযত করুন

আপনার মতামত